বাব-এ-শরীয়ত

লেখকঃ

পীরজাদা সৈয়দ মহঃ একবাল শাহ আলকাদেরী

এম.এ(গোল্ড মেডালিষ্ট)

নায়েব সাজ্জাদানশীন

দায়রা শরিফ-এ কাদেরিয়া

৪০, সি. সামশুল হুদা রোড

কলিকাতা-১৭

প্রথম প্রকাশঃ ১৬ মার্চ (২০১১)

দ্বিতীয় প্রকাশঃ মে ২০১২/জমাদিউল আখির ১৪৩৩

মুদ্রণেঃ

শান পবলিকেশন

হাদিয়াঃ ৩৫ মাত্র।

অক্ষরবিন্যাস ঃ

আদিল গ্রাফিক্স

৩৪, ফিয়র্স লেন, কোলকাতা-৭০০ ০৭৩

দূরভাষ-৯৩৩০৮৮৩৪৯১

প্রকাশক ঃ

কাদেরিয়া একাডেমী

৪০, সি. সামশুল হুদা রোড

কলিকাতা-১৭

ফোনঃ (০৩৩) ২২৯০ ৪২৭৩

ভূমিকা

প্রথমেই আমি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদাকরি, যিনি আমাকে এই বই লেখার তৌফিক দান করেছেন। ইশলাম ধর্মের মূল ভীত বা স্থম্ভ পাঁচটি। যথা-১। কলেমা, ২। নামাজ, ৩। রোজা, ৪। হজ্ব ও ৫। যাকাত এই পাঁচ স্তম্ভ বা ভীত সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানা অনেকের সম্ভব হয় না বা অনেকের জানা থাকে না। তাছাড়া আমার সিলসিলার ভাই ও বোনেরা যাতে বিশদভাবে এই পাঁচ স্তম্ভ বা ইশলামের বুনিয়াদ সম্বন্ধে জানতে পারেন, তাই এই কেতাবের অবতারনা বা লেখা।

আবার ক্বোরআন শরীফের ঐ বিশেষ আয়াতের প্রতি লক্ষ্যরেখে বা ঐ অনুপ্রাণীত হোয়ে এই কেতাবের অবতারনা-আয়তটি.....লা তাক্বরাবুস্ব স্বালাতা আনতুম শোকারাহত্তা তাকুলুন মা লা তায়লামুন-বিশেষ করে হাত্তা তাকুলুন মা লা তায়ালামুন এর উপর এর বিশেষে জোর দিয়ে এই কেতাবের অবতারনা যার অর্থ- 'ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু বোলনা যা বুঝো না' - তবে কি না বোঝার জন্য নামাজ ছেড়ে দিবেন? নিশ্চিই না। নামাজ পড়ুন অন্যান্য এবাদত করুন তশবীহ পাঠ করুন তার সাথে অর্থ বুঝবার চেষ্টা করুন। প্রতি শব্দের অর্থ বুঝে নামজ বা অন্যান্য এবাদৎ মনঃসংযোগ বেশি হবে তাতে পড়ার আগ্রহ বাড়বে। সবকিছু বুঝতে পারলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ সুগম হবে। না বুঝে এবাদৎ করলে তার কোন স্বাদ পাওয়া যাবে না। এই জন্যই এই কেতাবে ইশলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভ বা বোনিয়াদ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে মানে এবং ব্যাখ্যা সহ বলা হয়েছে। এই কেতাবের বৈশিষ্ট্য হল যে বইটিতে আরবী এবং তাহার বাংলা উচ্চারণ ও আক্ষরিক মানে সহ সকল প্রকার নিয়ত দেওয়া হয়েছে। যেটা বাজারের বই-এ পাওয়া যায় না, - আর যাতে সাধারণ মানুষ সহজে পড়ে বুঝতে পারেন ও সহজে আমল ও আমলের প্রতি দৃঢ়তা পোষণ করতে পারেন তারই চেষ্টা।

এই সমস্ত আমল গুলি জেনে সঠিক পথে পরিচালিত হতে হলে একজন পীর-এ কামেল ব্যক্তির সহচার্য দরকার। তাই এই কেতাবে পীর মুরীদ এবং সিল সিলা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ ভাবে বলা-এই কিতাবটি প্রকাশ করার পিছনে দুনিয়া দারীর কোন স্বার্থ নাই বরং দীনের স্বার্থই খোঁজা হয়েছে।

অবশেষে আমি ধন্যবাদ জানাই জনাব ইদ্‌রিশ কাদেরী সাহেবকে যিনি এই কেতাব লেখার সময় বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে। আল্লাহর কাছে দোওয়া চাই আল্লাহ তায়ালা পাঠকদের তৌফিক দেন যেন সকলে এই কেতাব পাঠ করে এবং আমল করে দীন ও দুনিয়াতে কামিয়াবী হাসিল করতে পারেন। আমীন, ষুম্মা আমীন।

সৈয়দ মুহম্মদ একবাল শাহ আল্‌কাদেরী

-ঃসূচিপত্রঃ-

১।	আরবী বর্ণের উচ্চারণ	-	১
২।	ইশলাম ও ইশলামের তরীকা	-	২
৩।	নামাজ	-	৭
৪।	নামাজের ওয়াক্ত বা সময়	-	৯
৫।	পাঁচওয়াক্ত নামাজের ফরয, শুন্‌নাত ও নফল	-	১০
৬।	নামাজ পড়ার নিয়ম	-	১১
৭।	নামাজের সংক্ষেপে শুরাহ	-	২০
৮।	নামাজের নিয়ত সমুহ	-	২৬
৯।	ঈদের নামাজ	-	৩৬
১০।	রোজা বা স্বোত্তম	-	৪৫
১১।	যাকাত	-	৪৩
১২।	হজ্জ	-	৪৬
১৩।	ওমরাহ	-	৫১
১৪।	ওমরাহ কী ভাবে আদা করবেন	-	৫১
১৫।	কাবা শরীফ জিয়ারত	-	৫৮
১৬।	মদীনা শরীফ জিয়ারত	-	৫৯
১৭।	বাইয়াত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা	-	৬১
১৮।	আমার হুজুর কিবলাহ	-	৭০
১৯।	খলীফা	-	৭২

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

"পরম কুরুণাময় ও দয়ামত আল্লাহর নামের সাথে শুরু করছি"

আরবী অক্ষরের উচ্চারণঃ যদিও আরবী অক্ষরের ঠিক ঠিক প্রতি অক্ষর ঠিক করা খুবই কঠিন তবু কিছুমাত্র চেষ্টা যাতে করে কাছাকাছি হয়।

সাধারণ উচ্চারণঃ

বাংলা	আরবী	ভেঙে
অ –	ا ع ء ى	অ – ا য় ع অ ء য় ى
ব –	ب و	ব – ب ওয় و
ত –	ت ط	ত – ت ত্ব ط
স –	ث س ش ص	স্ব – ص ش শ, س স ث
জ –	ج ذ ز ظ	জ – ج জ ظ য ز য্ব ذ
হ –	ح ه	হ – ه হ ح
খ –	خ	খ – خ
দ –	د ض	দ – د দ্ব ض
র –	ر	র – ر
গ –	غ	গ – غ
ফ –	ف	ফ – ف
ক –	ق ك	ক – ك ক ق
ল –	ل/لا	ল – ل
ম –	م	ম – م
ন –	ن	ন – ن
ঈ –	ي ے	ঈ – ے

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

(পরম করুণাময় ও দয়াময় আল্লাহ্‌র নামের সাথে শুরু করছি)

ভালোবাসার দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভঃ-

ইসলাম এবং ইসলামের তরীকা সম্বন্ধে জানা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। যারা ইসলামের তরীকার উপর আমল করেন আল্লাহ তায়ালা তাদের সব মুশকিল আসান করেন। তারা ইহকাল ও পরকালে সুখ-শান্তিতে থাকেন। যা আমাদের প্রিয় নবী করিম স.আ.সা. সকল মানব জাতির উদ্দ্যেশে ব্যক্ত করেছেন। পীরানেপীর দাস্তেগীর সুলতানুল আওলিয়া হজরত গওসুল আজম মানব জাতিকে যে এবাদত, রেয়াজত, মানবতা এবং ভালবাসার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ দেখিয়েছেন। আমাদের হুজুর কিবলাহ হজরত সৈয়দ মানাল শাহ আল কাদেরী আল বাগদাদি তাঁরই পথ অনুসরণ করে নিজের মুরীদ ও ভক্তদিগের নিম্নলিখিত উপদেশ গুলি দেন।

ইসলামের মূল স্তম্ভ

১) কালেমা, (২) নামাজ, (৩) রোজা, (৪) হজ ও (৫) যাকাত।

"কালেমা"

যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে এবং আন্তরিকতার সাথে এই কালেমা যথা لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ (লা এলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মাবুদ বা উপাসক নেই মোহাম্মদ সল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র প্রেরীত দূত বা রাসুল পড়বে ও মানবে সেই মুসলমান হবে। কালেমা শরীফের অনেক ফজিলত আছে। ব্যাপক ভাবে কালেমা পড়া উচিৎ। হাদীস শরীফে এমন ও উল্লেখ আছে। যে ব্যাক্তি একিন দিলে কালেমা শরীফ পড়বে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না।

নামাজ (الصَّلٰوةُ) আস্বস্বালাত

নামাজ ইসলামের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য (ফরজ) শরীয়ত নির্দ্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট নিয়মে ঈমানের সাথে পাক ও পবিত্র অবস্থায় এবং পাক ও পবিত্র জায়গায় কাবা শরীফের দিকে মুখ করে ও আল্লাহ তায়ালাকে হাজের ও নাজের জেনে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় অতি নম্রতার সাথে তাঁর অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার মহিমা, প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে মৌক্ষিক ও দৈহিক কার্য্যাদি দ্বারা নিজ প্রভূর প্রাধন্য, মহত্ব স্বীকার করে ও নিজের দীনতা ও হীনতা প্রকাশ করে মাথা নত করে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হওয়া অর্থাৎ রুকু ও শাজদা করার অনুষ্ঠানকে শরীয়ত মেত নামাজ বলে। নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় রোকন। এটা আল্লাহ্ তায়ালার অতিপ্রিয় এবাদত এবং সকল এবাদতের শ্রেষ্ঠ এবাদত। পাক ক্বোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা নামাজ কায়েম করা বা প্রতিষ্ঠা করার কথা বিরাসিবার তাকীদ দিয়েছেন।

اَقِيْمُوا الصَّلٰوة وَاٰتُوا الزَّكٰوة (আক্বীমুস্ব স্বালাত ওয়া তুযযাকাত) নামাজ ক্বায়েম কর এবং যাকাত দাও।

যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে ও সঠিক ভাবে নামাজ পড়ে ও যাকাত দেয় আল্লাহ তায়ালা তাদের নিজ হাতে পুরস্কার দিবেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ه وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يَحْزَنُوْنَ ه

ইন্নাল লাজ্বীনা আমানু ওয়া য়ামেলুস্সালি হাতি (নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে) ওয়া আক্বা' মুস্সলাতা ওয়া আ তুযযাকাতা (এবং নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত দেয়) লাহুম আজরোহুম ইন্দা রাব্বেহিম (তাদের জন্য তাদের প্রতি পালকের নিকট পুরস্কার আছে) ওয়ালা খাওফুন য়ালাঈহিম ঈয়াহযানুন (এবং তাদের জন্য ভয়ের কারণ নেই তারা দুঃখিত হইবে না।)

নামাজ সম্পর্কে রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অনেক নির্দেশ দিয়েছেন যেমন নামাজ ধর্মের খুঁটি। যে ব্যক্তি তা দৃঢ় রাখে সে ধর্মকে দৃঢ় রাখে, নামাজ মোমেনদের কাছে মেয়রাজ স্বরূপ। **اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ** (আস্বস্বালাতো মেরাজুল মোমেনিন) হাদীস শরীফে আছে মুসলমান ও কুফ্রীর মধ্যে পার্থক্য কর বস্তু হোল 'নামাজ' । নামাজকে যারা ইনকার করে বা অস্বীকার করে তারা মুসলমান নয়। তারা কাফের। দৈনিক গোসলদ্বারা যেমন শরীরকে ময়লা থেকে পরিস্কার রাখা যায়, তেমনই নামাজ দ্বারা সমস্ত রকম গুনাহ বা পাপ কাজ থেকে পাক পবিত্র রাখা যায়। ঠিক ভাবে নিয়মিত একিন দিলে বা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রেখে নামাজ পড়লে মানুষ সব রকম গুনাহ বা কুকাজ ও সবরকম নাজায়েজ কাজ থেকে দূরে থাকে। তাই ক্বোরআন শরীফে আছে **اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (২১ শ পারা পুরা আনকাবুত) নামাজ পড়া ও প্রতিষ্ঠা করা অশেষ সওয়াবের কাজ এবং নামাজ আল্লাহ তায়ালার একমাত্র নৈকট্য লাভের পথ। একে অস্বীকার করলে কাফের ও বিনা ওজরে ছেড়ে দিলে মহাপাপী হোতে হবে।

নামাজ কয় প্রকারঃ-

নামাজ চার প্রকারঃ- (১) ফরজ বা অতি অবশ্যই করনীয়। নিয়তে বলতে হয় **فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى** (ফারজুল্লা-হে তায়ালা, এই নামাজ কোন ভাবেই ছাড়া যাবে না। অসুস্থ্যতার কারনে ক্বাজা করলে আদায় অবশ্যই করতে হবে। (২) ওয়াজেব এটাও অবশ্যই করনীয়/অপরিহার্য কর্তব্য। নিয়তে বলতে হয় **وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى** (ওয়াজে বুল্লাহে তায়ালা) এই নামাজ প্রতিদিন এশ্বার নামাজের পর বেতের নামাজ এবং বছরের দুই ঈদ-এর নামাজ। তবে দুই ঈদে শরীর অসুস্থ্য থাকলে পরে আদায় করতে হবে না। কিন্তু বেতের কাযা করলে তাহা অবশ্যই আদায় করতে হবে। (৩) সুন্নাতঃ তরিকায়ে রসুল এই নামাজ দুই প্রকারঃ (ক) রসুলেপাক (সাঃ) যা প্রতিনিয়ত পালন করতেন তা মোয়াক্কেদা। এটা ছাড়লে চলবে না। ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়ার সময় অবশ্যই

আদায় করতে হবে। (খ) সুন্নাতে গায়ের মোয়াক্কেদা-এই নামাজ আদায়ে সওয়াব বেশী, না আদায়ে দোষ নেই। ইহা রসুলেপাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো আদায় করতেন। নিয়তে বলতে হয় সুন্নাতে রাসুলিল্লাহে তায়ালা-

سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى (৪) নফলঃ- এই নামাজ আল্লাহ পাক এবং রসুলেপাক (সাঃ) -এর নির্দেশ ছাড়া অতিরিক্ত নামাজ পড়লে সওয়াব না পড়লে দোষ নেই। তবে পড়লে অতিরিক্ত সওয়াব পাওয়া যায়। নিয়তে বলতে হয় নফল **نَفْلٌ**

নামাজের ওয়াক্ত বা সময়ঃ-

নামাজের ওয়াক্ত সাধারণতঃ ৫ টি যথা-(১) ফজর **اَلْفَجْرُ** এই নামাজ সুবহে স্বাদেকে আদায় করতে হয়। রাতের শেষ অংশে যখন পুবদিক অন্ধকার ভেদ করে সামান্য আলো দেখা যায় বা পূবদিক গাঢ় কাল থেকে সামান্য আলো বা ধুসর হওয়া থেকে সূর্য্য উদয়ের আগের সময় পর্যন্ত। (২) জ্বোহর **اَلظُّهْرُ** দুপুরের পর যখন সূর্য মাথার উপর থেকে সামান্য পশ্চিমে হেলে যায় ঐ সময় থেকে কোন বস্তুর ছায়া ২ গুণ হওয়ার আগে পর্যন্ত। (৩) আস্বর **اَلْعَصْرُ** জোহরের ওয়াক্ত শেষ হবার পর থেকে অর্থাৎ কোন বস্তুর ছায়া ২ গুণ হওয়া থেকে সূর্য ডুবে যাবার আগে পর্যন্ত। (৪) মাগরিব **اَلْمَغْرِبُ** সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে অর্থাৎ শরীরে লোমের গোড়া না দেখতে পাওয়া থেকে আরও ১ ঘন্টা পর্যন্ত। (৫) এশ্বা **اَلْعِشَاءُ** মাগরিবের ১ ঘন্টা বা দেড় ঘন্টার পর থেকে মধ্য রাত্রী পর্যন্ত। এর পরেও পড়া যায় সুবহে স্বাদকের আগে পর্যন্ত। তবে মধ্য রাতের আগেই পড়া ভাল। শেষের দিকে পড়া শুধু কাযা চেয়ে ভাল। সকল নামাজই ওয়াক্তের প্রথমের দিকে পড়া ভাল। আওয়াল ওয়াক্তে পড়লে আল্লাহ তায়ালার প্রতি বা তাঁহার নামাজের প্রতি ভালবাসা বেশী প্রকাশ পায়।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফরজ নামাজঃ-

রসুলেপাক (সাঃ) মেরাজে গিয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পাঁচ ওয়াস্ত নামাজের আদেশ পান। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে ফরজ নামাজ অবশ্যই পালনীয়। এই নামাজ মোট ১৭ রাকাত। এর মধ্যে জুমার দিন জোহারের চার রাকাত ফরজে র নামাজের পরিবর্তে এমামের সাথে দুই রাকাত ফরজ নামাজ পড়তে হয় এবং দুই খোৎবা শোনা এবং এমামের দিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্যই করণীয়। খোৎবার সময় কোন নামাজ দূরস্ত নেই। ১৭ রাকাত ফরজ নামাজের মধ্যে ফজরের ওয়াক্তে ফরজ ২ রাকাত জোহরের ওয়াক্তে ৪ চার রাকাত। আস্বরের ওয়াক্তে ৪ চার রাকাত-মাগরীবের নামাজের ৩ তিন রাকাত ও এশ্বার নামাজের ৪ চার রাকাত।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সুন্নাত নামাজ মোট ২০ কুড়ি রাকাত। এর মধ্যে গায়ের মোয়াক্কেদা ৮ আট যেটা না পড়লে দোষ নেই কিন্তু পড়লে সওয়াব বেশী এটা হোল আস্বর-এর ৪ চারি রাকাত যাহা আস্বরের ফরজ নামাজের আগে পড়তে হয় এবং এশ্বার নামাজের ফরজ নামাজ পড়ার আগে পড়তে হয় ৪ রাকাত। মোয়াক্কেদা ১২ বার রাকাত যা অবশ্যই পড়তে হয়, না পড়লে গোনাহগার হতে হয়। যথা (ক) যা ফজরের ওয়াক্তে দুই রাকাত যেটা ফরজ নামাজের আগে পড়তে হয়। (খ) জোহারের ওয়াক্তে ফরজ নামাজের আগে ৪ চারি রাকাত ও পরে ২ দুই রাকাত। (গ) মাগরিবী-এর ওয়াক্তে ফরজ নামাজের পরে ২ দুই রাকাত এবং (ঘ) এশ্বার ওয়াক্তে ফরদ্ব নামাজের পরে পড়তে হয়। এছাড়া আরও ২০ কুড়ি রাকাত সুন্নাত নামাজ তারাবি আছে যা রমজান মাসে প্রতিদিনই এশ্বার নামাজের পরে দুই রাকাত করে, দশ নিয়তে আদায় করতে হয়।

ওয়াজেব নামাজ মোট ৭ (সাত) রাকায়াত। এর মধ্যে প্রতিদিন এশ্বার নামাজের পর ৩ (তিন) রাকাত নামাজ। এই নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে। ছাড়া যাবে না ক্বাজা করলে অবশ্যই আদায় করতে হবে। এবং দুই ঈদের নামাজে দুই রাকাত করে চার রাকাত। এটা ওজর অসুস্থতা বশত ক্বাজা করলে আদায় করতে হয় না।

নফলঃ-

নফল নামাজ সাধারণতঃ- ৮ (আট) রাকাত। (ক) জ্বোহরের ওয়াক্তে সবার শেষে দুই রাকাত। (খ) মাগরিবের নামাজের শেষে দুই রাকাত। (গ) এশ্বার দুই রাকাত ও (ঘ) বেতেরের শেষে দুই রাকাত। এ ছাড়া আরও নফল আছে যা বুজুর্গানে দীন গন সারা রাত নফল নামাজে বা এবাদতে কাটিয়েছেন।

নামাজ পড়ার নিয়মঃ-

আমাদের নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন ভাবে নামাজ পড়েছেন তেমন ভাবে নামাজ পড়া-ই আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাইতো নবী করীম (সাঃ) বলেছেন 'নামাজ মোমিনদের জন্য মেয়রাজ স্বরূপ' **اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ** (আস্বস্বালাতো মেয়রাজুল মুয়মেনীন) নবী করীম (সাঃ) মেয়রাজে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি আল্লাহ্ পাক্কে নিজ চোখে দেখেছেন এবং সামনা সামনি বসে কথাবার্তা বলেছেন। যা আর কোন নবী (সাঃ) এর সৌভাগ্য হয়নি। তাই আমাদের হুজুর কিবলা নামাজ পড়ার যে রকম নির্দেশ দিয়েছেন তা সচারাচর দেখা যায় না। তিনি নবী, রাসুল, ওলি, অউলিয়া। গওস, কুতুব এঁদের নামাজ পড়ার তরীকা অনুযায়ী নামাজ পড়ার আদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন। আর মেয়রাজ কথার উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত লাভের সুন্দর বা একমাত্র পথ হোলো নামাজ।

পৃথিবীতে যত ওলি, আউলিয়া, গওশ, কুতুব এসেছেন তাঁরা সকলেই এমন ভাবে নামাজ পড়েছেন যেন তাঁরা আল্লাহ্ পাক্কে সামনা সামনি দেখেছেনঃ এবং আল্লাহ পাকের নিকট পরম বিশ্বাসে সাথে বিষয় আরজ করছেন। তাইতো হাদীশ শরীফে ব্যাখ্যা হয়। **لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ** (লা স্বালাতা ইল্লা বেহুদ্বরিল ক্বোলুব) নামাজ হয় না যদি না আন্তরিকতা থাকে। লোক দেখান নামাজ-এ নামাজ পড়া হয় তবে স্বাদ পাওয়া যায় না। সেই জন্য আমার হুজুর পাক্ বলেছেন, নামাজ পড়ার সময় যা কিছু পড়বেন যেমন নামাজের নিয়ত শুরাহ, তসবীহ, দোওয়া দরূদ ও মোনাজাত ইত্যাদি, তার মানে গুলি অর্থাৎ কথাগুলি কি বলছেন তা মন দিয়ে বা অন্তর দিয়ে বুঝে পড়বেন। তা হোলেই প্রকৃত নামাজের স্বাদ পাওয়া যাবে।

আমাদের হুজুর কিবলা নামাজ পড়ার যে নিয়ম বলেছেন তা এখানে আলোচনা করা হল। প্রথমে পাক সাফ অবস্থায় অর্থাৎ নামাজ পড়ার আগে শরীরে না পাকি থাকলে বা শরীর পাক্ নয় এরূপ ধারনা হোলে বা এরূপ মনে আসলে, গোসল করে বা ওজু করে নিতে হবে। এবং পরিধানের কাপড় চোপড়- এ নাপাকি আছে মনে করলে ঐ পরিধানের কাপড় বদলে দিয়ে বেশ পবিত্র জায়গায়, সতর ঢাকা অবস্থায় যথাঃ- পুরুষদের নাভী থেকে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকেদের সমস্ত শরীর, হাত, পা (মুখমন্ডল ছাড়া) সমস্ত অংশ ঢেকে নেওয়া কেবলা মুখী হয়ে যে নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছেন সেই নিয়ত করে, সংসার-এর সবরকম ভাবনা ভুলে আল্লাহ তায়ালার সামনে হাজির হয়েছেন জেনে ও কাবা শরীফের সামনে হাজির হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে দেখছেন ও যা কিছু পড়ছেন বা বলছেন তা সবই আল্লাহ পাক শুনছেন এ ভাবনা নিয়ে অতি নম্রতার সাথে এবং আপনার এই নামাজটাই হয়তো শেষ নামাজ (বোধ হয় আল্লাহ তায়ালার ডাকে এখনই চলে যেতে হবে) আপনি আপনার দুনিয়ার সকল বস্তু অপেক্ষা প্রিয় বস্তুর সামনে হাজির হয়েছেন ও শুরার মধ্য দিয়ে আপনার আরজি জানাচ্ছেন তাই ক্বোর্আন শরীফে আল্লাহ পাক বলেছেন-

حَفِظُوا عَلَى الصَّلٰوتِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ হাফেজু য়ালা স্বালাওয়াতে ওয়া ক্বুমু নিল্লাহে ক্বানে তীন) অর্থাৎ নামাজের প্রতি যত্নবান হও এবং আল্লাহ পাকের নিকট বিনীত ও নম্রতার সাথে দাঁড়াও। (শুরাতোল বাকারাহ ২৩৮) আবার হাদীস বুখারীতে জানান হচ্ছে। নামাজে এমন ভাবে দাঁড়ান যেন আল্লাহ্ পাককে দেখতে পাচ্ছেন আর যদি না দেখতে পান, অন্ততঃ এমন ভাবনা রাখুন যেন আল্লাহ পাক আপনাকে দেখছেন।

নামাজ পড়ার ধারা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই দাঁড়িয়ে শুধু ফরজ নামাজই নয় সকল নামাজই চাই শুন্নাত বা নফল দাঁড়িয়ে আদায় করবেন। কোন কারণ ছাড়া ফরজ নামাজ বসে আদায় করা যাবে না। মনে রাখবেন শুন্নাত ও নফল নামাজ বসে আদায় করলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, দাঁড়িয়ে আদায় করলে তার ২ গুণ সওয়াব পাওয়া যায়। অতএব সকল নামাজেই দাঁড়িয়ে আদায় করা ভাল।

জায়নামাজে দাঁড়িয়ে এই দোওয়া পাঠ করতে হয়। যথা-

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَآاَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ہ

(ইন্নী ওয়াজ্জাহতো ওয়াজহিয়া লিল্লাজী ফাত্বারাশ শামাওয়াতে ওয়াল আরদ্বা হানীফাঁউ ওয়া মা আনা মিনাল মুশ্বরে কীন) নিশ্চয় আমি তাঁরই দিকে মুখ ফিরালাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আমি কখনই মোশ্বরেকদের মধ্যে নাই। এর পরে নিয়ত বা মনের বাসনা আল্লাহ তায়ালাকে জানান।

নাওয়ায়তো আন (আমি নিয়ত করছি) ওস্বাল্লেইয়া (নামাজ পড়ার) লিল্লাহে তায়ালা (আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) রাক্য়াতাই স্বালায়াতিল ফাজরে (দুই রাকাত ফজরের নামাজের) এখানে চার রাকাত হলে আরবা রাকায়াতাই স্বালাতে তিন রাকাত হলে সালাসা রাকায়াতে স্বালাতঃ এবং ফজর/জোহর/আসর/মাগরিব/এশা) ফারজুল্লাহে তায়ালা (আল্লাহ তায়ালার ফরজ) সুন্নাত হলে সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ তায়ালা এবং নফল হোলে নাফলী) মোতাওয়াজ্জিহান (মুখ ফিরিয়ে) এলা জেহাতিল কাবাতিশ্শরীফতি (কাবা শরীফের দিকে) আল্লাহো আকবর (আল্লাহ্ মহান) বলার সাথে সাথে ভাববেন - যেন আল্লাহ্ পাক এর মহত্ব অতি বিসাল আমি তাহার কাছে নগন্য। আমি তাঁকে ঐ ভাবেই দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহো আকবর বলার সাথে সাথে তকবীর দিয়ে অর্থাৎ দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুগুলি কানের লতি স্পর্শ করিয়ে নাভির নিচে তহরীমা বাঁধতে হয়। এর পর মনে অর্থাৎ শব্দ না করে দোওয়া শানা যথাঃ-

سُبْحٰنَکَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ السْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ وَلَا اِلٰهَ غَیْرُکَ۔

(সুব্হানাকল্লা হুম্মা) হে আল্লাহ্ তুমিই পবিত্র। (ওয়া বে হামদেকা) এবং তোমারই প্রশংসা করি। (ওয়া তাবারাকাশ মোকা) এবং তোমার নাম বরকতময়, (ওয়া তায়ালা জাদ্দোকা)এবং তোমার মর্যাদা সবার উপরে, (ওয়া লা এলাহা গায়রোকা) এবং তুমি ছাড়া কেহই এবাদতের যোগ্য নয়। এরপর তাউয যথা- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَیْطَانِ الرَّجِیْمِ (আউযো বিল্লাহে মিনাশ্ শায়তান-নির্রজীম) আমি বিতাড়িত শয়তানের থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি) তারপর তাসমিয়া যথা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (বিশ্মিল্লাহির্ রাহমানির রহীম) আল্লাহ্র নামের সাথে যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু -এর পর সুরা ফাতেহা অর্থাৎ আলহাম্দো লিল্লাহি রাব্বিল-ওয়াল্দ্বাল্লিন ও ক্বোরআন শরীফের যে কোন 'সুরাহ পাঠ করে আল্লাহ্ আকবর বলে (ফরজ নামাজে উচ্চ স্বরে যেন অপর কেউ শুনতে পায়। এবং নফল ও সুন্নাত নামাজে মনে মনে স্বর না করে) রূকু যাহা হাঁটুর মাথা দুই হাতের তালুর মাঝে রেখে আঙ্গুল দিয়ে শক্ত করে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে রূকুর তসবীহ তিন বার পাঁচবার মনে মনে শব্দ না করে سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ সুবহানা রাববিইয়াল আজীম অর্থাৎ আমার মহান প্রভুই সর্বাপেক্ষা বড় ও পবিত্র (এই তসবীহ-এর সময় ধারনা করবেন যেন আল্লাহ্ তায়ালার বিশাল ছত্র ছায়ায় আমি আশ্রয় নিচ্ছি) বলে তস্বীহ শেষে তাসমী سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ যথা শামেয়াল্লাহো লেমান হামে দাহ- অর্থাৎ যে কেহ আল্লাহ্র প্রশংসা করলে তিনি তা শুনতে পান (নফল ও শুন্নাত নামাজে আস্তে কেউ না শুনতে পাই ফরজ নামাজে উচ্চ স্বরে সবাই যেন শুনতে পাই) বলে উঠে দাঁড়িয়ে তাহমীদ যথা-

رَبَّنَالَکَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকাল হাম্দ) অর্থাৎ হে আমার প্রভু তোমারই জন্য প্রশংসা। মনে মনে অর্থাৎ শব্দ না করে বলে পুনরায় اَللّٰهُ اَکْبَرُ আল্লাহ্ আকবর বলে শেজ্দাহ তে যেতে হয় এবং শেজ্দাহ-র তসবীহ্ যথা سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی সব্হানা রাব্বিয়াল আলা অর্থ আমার মহান প্রভুই সর্বাপেক্ষা উপরে ও সর্বাপেক্ষা পবিত্র। তিনবার পাঁচবার পড়তে হয়। এই তশবীহ পাঠের সময় মনে করবেন আল্লাহ্ অনেক উপরে এবং আমি সবার নীচে আছি এইরূপ ধারণা নিয়ে নিজের দীনতা প্রকাশ করবেন। শেজ্দার নিয়মে-প্রথমে হাঁটু দুটি ভেঙে জায়নামাজ সহ মাটি স্পর্শ করবে।

পরে হাত দুটি জায়নামাজে হাঁটু হতে সামান্য দূরে (হাতের আঙ্গুল সহ চেটো পরিমান দূরে) পাশ পাশি রাখবে যেন দুই হাতের তর্জনি দুই কানের লতির কাছে হয়। এই রূপে রেখে মাথানত করিবেন প্রথমে নাক ও পরে কপাল মাটি স্পর্শ করবে এবং ওঠার সময় বা শেজদাহ থেকে ওঠার সময় প্রথমে কপাল পরে নাক ও পরে হাত ও সবশেষে হাঁটু উঠবে। এবং পুনরায় আল্লাহো আকবর **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** বলে উঠে বসে দোওয়া পড়বেন যথা-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَاهْدِنِىْ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ার হাম্নী ওয়ার যুক্কনী ওয়াহ্দেনী (আল্লাহ্ পাক আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে জীবিকা দেন ও আমাকে হেদায়েত করুন বা আমাকে আপনার নির্দেশিত পথে চালনা করুন) এই দোওয়া পাঠ করলে কেহ রিজিকের কষ্ট পাবেন না। (সু,ইবনে, মাজা) বলেও বা শুধু আল্লাহো আকবার বলে বা পুনরায় তকবীর দিয়ে ও দ্বিতীয় শেজদাহ্ সেরে দ্বিতীয় শেজদাহে পুনরায় তসবীহ পাঠ করে আল্লাহো আকবর বলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথম রাকায়াতের মত দ্বিতীয় রাকায়াতে সুরাহ ফাতেহার পর যে বেশ সুরাহ পাঠ করে প্রথম রাকায়াতের মত রূকু শাজ্দাহ শেষ করে বসে বসে যদি ফজরের ফরজ নামাজ হয় তবে পূর্ণ আততাহীয়াতো দারুদ ও দোওয়া মাসুরা সহ পাঠ করতে হবে-

اَلتَّحِيَّاتُ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ه
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

আততাহী য়াতুঃ-

আততাহী য়াতু লিল্লাহি (আমার সব রকম মৌখিক এবাদত আল্লাহর জন্য) **ওয়াস্ব্স্বলাওয়াতো** (এবং আমার নামাজ আমার শারীরিক এবাদত) **ওয়াত্ত্বাঈ ঈবাতো** (এবং আমার আর্থিক এবাদত) **আসসালামো আলাইকা** (আপনার প্রতি শান্তি আসুক) **ইয়া আইয়োহান্ নাবীয়ো** (হে আমাদের নবী) **ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতোহু** (এবং আল্লাহ তায়ালার রহমত ওবরকত হোক আপনার উপর) **আসসালামো আলায়না** (শান্তি আসুক আমাদের উপর) **ওয়া আলা এবাদিল্লাহি স্বালেহীন** (এবং যারা আল্লাহ্ তায়ালার এবাদত করে তাদের প্রতিও) **আশ্হাদো আল্লা** (আমি সাক্ষ্যে দিচ্ছি যে) **এলাহা** (কেউ উপাস্য নাই) **ইল্লাল্লাহো** (কিন্তু আল্লাহ্ আছেন) **ওআশাহাদো আন্না** (এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে) **মোহাম্মাদান আবদোহু** (মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার রসুল) **ওয়া রাসুলোহু** (এবং তাহার প্রেরীত দূত রসুল)।

আততাহেয়াত, পাঠ করার সময় যখন আশ্হাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহো আশাহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু ওয়া রাসুলোহু বলবেন তখনই ডান হাতের বৃদ্ধা মধ্যমা-একত্র করে এবং শ্বাহদত বা তর্যনী তুলবেন। দুই রাকায়াত হলে এর সাথে দরূদ ও দোওয়া মাসুরা পাঠ করে সালাম ফিরাবেন। তিন বা চার রাকায়াত পুনরায় আল্লাহো আকবর বলে উঠে দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকায়াত এবং চতুর্থ রাকায়াত আদায় করে দরুদ ও দোওয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরাবেন।

দরূদঃ-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ه اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ه

<u>বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-</u>

আল্লাহুম্মা স্বাললে (হে আল্লাহ অর্নুগ্রহ বা শান্তিদিন) **আলা মোহাম্মাদেঁও** (মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর) **ওয়া আলা আলে মোহাম্মাদিন** (মোহম্মদ (সাঃ) এর বংশধরগণের উপর) **কামা স্বাল্লাঈতা** (যেমন শান্তি বা অনুগ্রহ) **আলা ইব্রাহীমা** (আলায় হে স্বালাম এর উপর) **ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা** (এবং ইব্রাহীম আলায় হে সালাম -এর বংশধর গনের উপর) **ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ** (নিশ্চই আপনি প্রশংসিত ও মহান)।

আল্লাহুম্মা বারেক (হে আল্লাহ্ পাক আপনি বরকত দিন) **আলা মোহাম্মাদেঁও** (মোহাম্মাদ সাঃ) এর উপর) **ওয়া আলা আলে মোহাম্মাদিন,** এবং মোহাম্মদ (সাঃ) বংশধর গনের উপর) **কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা** (যেমন বরকত দিয়েছেন ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর) **ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা** (এবং ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর গনের উপর) **ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ** (নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহান)।

দোয়া মাসূরা

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِجَمِیْعِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْاَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِکَ یَااَرْحَمَ الرَّحِمِیْنَ ه

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

আল্লাহুম্মাগ ফেরলী (হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করেন) **ওয়ালে ওয়ালেদাই ইয়া** (এবং আমার পিতা মাতাকে) **অলেমান তাওয়া লাদা** (এবং যারা জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে) **ওয়ালে জামিয়েল মো মেনীনা ওয়াল মো মিনাত** (এবং যে সকল মু'মেন পুরুষ এবং মুমেন স্ত্রীগণ জামায়েত হয়েছেন) **ওয়ালা মুসলেমনী ওয়াল মুসলিমাত** (এবং মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান স্ত্রী) **ওয়াল আহ্ ইয়ায়ে মিনহুম** (এবং তাদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন) **ওয়াল আমওয়াত** (এবং যারা মৃত্যু বরন করেছেন) **বেরাহ মাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন** (হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান আপনার দয়ার দ্বারা)।

অথবা

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا کَثِیْرًاوَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِکَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْم

সালাম ফিরাবেন প্রথাম ডান দিকে ও পরে বাম দিকে মুখ ফরিয়ে বলবেন **(আস সালামো আলাই কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্-)**

اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (আপনাদের প্রতি শান্তি ও আল্লাহ্ পাকের রহমত বর্ষণ হোক। নামাজ যদি তিন রাকাত বা চার রাকাত তবে দুই রাকাত নামাজ আদায়ের পর বসে আত্তাহিয়্যাতু এর অর্দ্ধেক অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতো অত্তাইয়েবাতো থেকে আশহাদু আললা এলাহা ইল্লাল্লাহো ওয়াজ হাদু আন্না মোহাম্মাদান আব্দাহু ওয়া রাসূলোহু পর্যন্ত মনে মনে বা নিঃশব্দে পাঠ করে পুনরায় ঐ একই নিয়মে শুধুমাত্র ফাতেহা পাঠ করে (যদি ফরয নামাজ হয়) তৃতীয় রাকাত বা চতুর্থ রাকাত শেষ করে সালাম ফিরাবেন, যদি শুন্নাত হয় তবে সূরাহ ফাতেহার সাথে ঐ সূরাহ-র পরের সূরাহ পাঠ করে যথাযথ নিয়মে নামাজ আদায় করে সালাম ফিরাবেন।

এরপর প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবেন আস্সালামো আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্ (আপনার প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার রহমত বর্ষিত হোক) এবং পরে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে ঐ একই ভাবে সালাম ফিরান। তারপর মোনাজাত বা প্রার্থনা অতি বিনয়ের সাথে অন্তরে মানে গুলি খিয়াল করে উচ্চ স্বরে বা মনে মনে বলেন।

মোনাজাত

رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّار۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْکَ رَحْمَةً اِنَّکَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۔ وَصَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ ۔ بِرَحْمَتِکَ یَااَرْحَمَ الرَّحِمِیْنَ ه

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

রাব্বানা (হে আমাদের প্রভু) **আতেনা** (আমাদেরকে দান করুন) **ফীদদুনীয়া** (জগৎ মাঝে) **হসানাতাও** (মালে সমৃধ) **ওয়া ফীল আখেরাতে** (এবং আখেরাতের বা পরপারের) **হাসানাতাঁও** (মঙ্গল সমূহ) **ওয়াকেন আযাবান নার** (এবং আমাদের দোযখের আগুন হতে রক্ষা করেন)।

রাব্বানা (হে আমাদের প্রভু) **লা তুফো** (ফিরিয়ে নিয়োনা) **কুলুবানা** (আমাদের অন্তর সমূহ) **বায়াদা** (দূর করিও না) **হুম হায়েতানা** (আমাদের হেদায়েত হইতে) **ওয়াহাবলানা** (এবং আমাদের দান করুন) **মিন্লা দুনকা** (আপনার নিজসব) **রাহমা** (রহমত বা শান্তি) **ইন্নাকা আনতাল ওহাব** (নিশ্চয়ই আপনি দাতা) **ওয়া মাললাল লাহো তালা** (এবং হে আল্লাহ তায়ালা

শান্তি বর্ষণ করুন) **আলা খায়রে খালকেহী** (আপনার সেরা সৃষ্টির উপর) **মোহাম্মাদিন** (মোহাম্মদ (সাঃ) এর সালাম এর উপর) **ওয়া আলা আলহি** (এবং তাঁহার বংশধর গনের উপর) **ওয়া আসাহাবেহি** (এবং তাঁহার সাহাবিদের) **আজমায়ীন** (সবার উপর) **বে রাহমাতিকা** (আপনার রহমদের সহিত) **ইয়া আরহামার রাহেমীন** (হে সর্বশ্রেষ্ট রহম দেনে ওয়ালা / করুনাময়)।

এশার নামাজ আদায়ের পর অর্থাৎ সুন্নাত, ফরজ ও নফল নামাজ আদায় করার পর তিন রাকাত বিতির নামাজ পড়তে হয় বা আদায় করতে হয়। যা অতি অবক্ষ্যই পড়া দরকার এবং এই ওয়াযেব নামাজ পড়ার নিয়ম অনুসারে দুই রাকাত নামাজ আদায়ের পর যাহা আধা আত্তাহিয়্যত পড়ে ঔঠে তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা অর্থাৎ আলহাম দুলিল্লাহ পড়ার পর সূরাহ্ 'এখলাস' অর্থাৎ কুল হু আললাহো আহাদ পড়ার পর তহরীমা পড়ে (হাতু খুলে দিয়ে পুনরায় মনে মনে তকবীর দিয়ে পুনরায় তহরীমা বেঁধে দোয়া কুনুত পাঠ করে যথা নিয়মে রুকু ও শীজদাহ সেরে যথা যথ আত্তাহিয়্যাতো, দরূদ শরীফ, দোয়া মাসূরা শেষ করে সালাম ফিরিয়ে বেতের নামাজ শেষ করিতে হয়। এবং এর পর পুনরায় দুই রাকাত নফল নামাজআদায় করতে হয়।

দোওয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ
وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ
وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ه

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়ীনোকা (হে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাইছি) **ওয়া নাসতাগ ফেরোকা** (এবং আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি) **ওয়া নু মেনো বেকা** (এবং আপনার প্রতি ঈমান এনেছি আপনার প্রতি বিস্বাস রেখেছি) **ওয়া নাতাওয়া ক্কালো আলাইকা** (এবং আমরা আপনার উপর ভরসা রেখেছি) **ওয়া নুসনী আলাইকাল খাঈরা** (এবং আপনার উপর সু প্রশংসা করছি) **ওয়া নাস কোরোকা** (এবং আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি) **ওয়ালা নাক ফোরাকা** (এবং আমরা আপনাকে অস্বীকার করি না বা কুফরী করিনা) **ওয়া নাখলায়ো** (এবং আমরা আপনাকে পৃথক করিনা) **ওয়া নাতরোকো** (এবং আমরা বাধা দিই না) **মাঁই ইয়াফ জোরোকা** (আপনার উদারতায়)। **আল্লাহুম্মা ইয়া কা না-বোদো** (হে আল্লাহ আমরা আপনারই এবাদত করি) **ওয়া লাকা নোসাল্লি** (এবং কেবলমাত্র তোমারই জন্য নামাজ পড়ি) **ওনাসজোদো ওয়া আলাইকা নাসয়া** (শেজদা করি ও তোমারই দিকে ধাবিত হুই) **ওয়া নাহফেদো** (এবং আমরা তোমারই খেদমত গোজার করি) **ওয়া নারজু রাহমাতেকা** (এবং তোমারই রহমতে আশা রাখি) **ওয়া নাখ্শা ইন্না আযাবাকা** (এবং তোমার দেওয়া শাস্তির বা আজাবের ভয় রাখি) **বিল কোফ্ফারে মুলহেক** (নিশ্চয় তোমার শান্তি বা আজাব কাফেরদের প্রতি প্রযুক্ত হবে)।

শোহ শেজদাহ

নামাজ পড়ার সময় কিছু ভুল হয়েছে মনে হলে শোহ শেজদাহ দিতে হয়। আত্তাহিয়্যাতো পড়ার পর আশ্হাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহো আশাহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদোহু ওয়া রাসুলোহু পর্যন্ত পড়ার পরে ডানদিকে সালাম ফিরে দুই শেজদাহ দিয়ে পুনরায় পূর্ণ আত্তাহিয়্যাতো দরূদ ও দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরতে হয়।

নামাযের সংক্ষেপে সূরাহ সমূহ

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ه اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ه مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ه اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ه
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ه صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ه غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّآلِّيْنَ ه (اٰمِيْنَ)

সূরাতুল ফাতেহা (প্রারম্ভিক অধ্যায়)

বিস্‌মিল্লাহীর রাহমানীর রাহীম (পরম করুনাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্ তায়ালার নামে সহিত) আরম্ভ করছি-

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

আল্‌হামদো লিল্লাহে (সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **রাব্বিল আলামীন** (সমস্ত জগতের প্রতিপালক) **আর রাহমানের রাহীম** (যিনি পরম করুনাময় ও পরম দয়ালু) **মালেকে ইয়াওমিদ্দীন** (শেষ বিচার দিনে/ধর্মীয় দিবসের মালিক) **ইয়া কা না বুদু** (নিশ্চয়ই আমরা তোমারই এবাদত করি) **অ-ইয়া কা নাসতায়ীন** (এবং নিশ্চয় আমরা তোমারই সাহায্য চাই) **এহদিনাস্ সেরাতাল মোস্তাকীম** (আমাদের মোস্তাকীমের পথ দেখাও) **সেরাতাল লাজীনা আনআমতা আলাই হীম** (যে পথে তাদের পুরস্তুত করেছেন) **গায়রিল মাগদুবে আলাইহিম** (তাদের পথ নয় যে পথে তাদেরকে) **ওয়ালাদ্দালীন** (যাদের তুমি লাঞ্ছিত করেছ) **আমীন** (কবুল কর)।

سُوْرَةُ الْفِيْلِ সূরাতুল ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ তায়ালার নামের সহিত আরম্ভ করছি যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رُبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ه اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَ هُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ه وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ه تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ه

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

আলামতারা (তুমি কি দেখো না) **কাইফা ফায়ালা** (কেমন করেছিল) **রাব্বোকা** (তোমার প্রভু) **বে আস হাবিল ফীল** (হস্তীবাহিনীদের সর্সারদের) **আলাম ইয়াজআল** (ব্যর্থ করেছিলেন) **কাইদাহোম** (তাহাদের সমস্ত চক্রান্ত) **ফী তাদলীলেঁও** (ভ্রান্তিতে বা ভুলে পরিনত করেছেন) **ওয়া আর সালা আলায়হিম** (এবং তাদের প্রতি পাঠিয়েছিলেন) **তায়রান আবাবীল** (আবাবিল পাখিদের) **তারমীহিম** (তাহাদের প্রতি) **বেহে জ্বারাতিম্** (তাদের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন) **মিন্ সিজ্জিলিন** (সিজ্জীল পাহাড় হতে) **ফাজায়ালাহুম** (অতঃ পর তাদের পাঠিয়েছেন) **কায়াসফিম মাকুল** (ভক্ষিত তৃনের মত কর)।

سُوْرَةُ الْقُرَيْشِ সূরাতুল কোরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ তায়ালার নামের সহিত আরম্ভ করছি যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ه اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ه فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ه الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ ه وَّاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ه

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

লে ইলাফে কোরাইশিন (কোরাইশ দের প্রতি বা প্রিয় হওয়ার জন্য) **ইলাফিহিম** (তাদের অভ্যস্ত রাখা হল বা তাদের প্রতিপত্তি বরাবর রাখা হল) **রেহ্‌লাতাশ শিতায়ে ওয়াচ্ছায়েফ** (শীত ও গ্রীষ্ম এর সফরের সম্পৃতি) **ফাল ইয়া'বুদো** (অতএব এবাদত কর) **রাব্বাহাজাল বাইতে** (এই সবের প্রভু) **আল্লাজি আৎআমাহুম** (যিনি তাদের খাবার খাইয়েছেন) **মিন জুয়েঁও** (ক্ষুধার্তে) **ওয়া আমানাহোম মিন খাওফ** (এবং ভয় হতে নিরাপত্তা দান করেছেন বা আশ্রয় দান করেছেন)।

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنُ সূরাতুল মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ তায়ালার নামের সহিত আরম্ভ করছি যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

اَرَاَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ه فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ه وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ه فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ه الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ه الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآئُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ه

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

আরায়াই তাল্লাজী (তুমি কি দেখছ এই ব্যক্তিকে) **ইউ কাজ্জেবু**

বিদ্দিন (যে ব্যক্তি ধর্মকে মিথ্যা বলে বিচারের দিনকে মিথ্যা বলে) **ফাযালেকাল লাজী** (সে তো ঐ ব্যক্তি) **ইয়াদুয়ুল ইয়াতীম** (এতীমদের তাড়িয়ে দেয়) **ওয়ালা ইয়াহুদ্দো** (এবং আগ্রহ দেখায় না) **আলা তায়ামিল মিসকীন** (মিসকীনদের খাওয়াতে) **ফা ওয়াইলুল্লিল মোসাল্লীনা** (ঐ সকল নামাজিদের কঠিন শাস্তি, জাহান্নামি) **আল্লাজীনা হোম** (ঐ ব্যক্তি তাহারা) **আন সালাতিহিম সাহুন** (যারা লোক দেখানো নামাজ পড়ে) **আল্লাজীনা হোম** (ঐ ব্যক্তি তাহারা) **ইউরাউনা** (শুধু লোককে দেখায়) **ওয়া ইয়াম নাউনাল মাউন** (এবং প্রতিবক্ষীদের প্রয়োজনীয় জিনিস দিতে নিষেধ করে)।

سُوْرَةُ الْكَوْثَرُ সূরাতুল কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ তায়ালার নামের সহিত আরম্ভ করছি যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

ইন্না আতায়না (নিশ্চয় আমি তোমাদের দান করেছি) **কাল কাওসার** (পারলৌকিক সরোবর/ঝর্না) **ফাসাল্লে** (তার পর নামাজ পর) **লে রাব্বেকা** (তোমার প্রভুর জন্য) **ওয়ানহার** (এবং কোরবানী দাও) **ইন্না শানেয়াকা** (নিশ্চয় যে তোমাকে ঈর্ষা করে) **হুয়াল আবতার** (সে নিঃ সন্তান, পশ্চাদানুসারক বিহীন)।

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ. সূরাতুল কাফেরুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ্ তায়ালার নামের সহিত আরম্ভ করছি যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ہ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ہ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ہ
وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ہ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ہ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ہ

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

কুল (বল) **ইয়া আইউহাল কাফেরুন** (হে বিশ্বাসগণ) **লা'আ'বুদো** (আমরা এবাদত করিনা) **মা'তাবুদুন** (তোমরা যার এবাত কর) **ওয়ালা আনতুম আবেদুন** (এবং তোমরা এবাদত কর না) **মা-আ'বুদ** (আমরা যার এবাদত করি) **ওয়ালা আনা আবেদুনা** (এবং আমরা এবাদত করিনা) **মা আ'বাততুম** (তোমরা এবাদত কর) **ওয়ালা আনতুম আবেদুনা** (এবং তোমরা এবাদত কর না) **মা-আ-বুদ** (আমরা যার এবাদত করি) **লাকুম দ্বী নুকুম** (আমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে বড়) **অলীয়া দ্বীন** (এবং আমাদের ধর্ম আমাদের কাছে বড়)।

سُوْرَةُ النَّصْرُ সূরাতুল নসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ্ তায়ালার নামের সহিত আরম্ভ করছি। যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ہ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ہ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ہ

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

এযা যা'-য়া (যখন পৌছাবে) **নাসরুল্লাহি** (আল্লাহের মহান্যে) **ওয়াল ফাৎহো** (এবং জয়/বিজয়) **আরায়াই তান নাসা** (দেখিবে লোকেরা) **ইয়াদ খুলুনা** (প্রবেশ করিবে) **ফী দ্বীনিল্লাহে** (আল্লাহর ধর্মে) **আফওয়াজা** (দলে দলে) **ফাসাব্বেহ** (অতঃপর মহীমা প্রকাশ কর) **বে হাম্‌দে রাব্বেকা** (তোমার প্রভুর প্রশংসার সাথে) **ওয়াসতাগ ফেরহু** (এবং তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর) **ইন্নাহু কানা তাউওয়াবা** (নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন অধিকতর ক্ষমাশীল)।

سُوْرَةُ اللَّهَبُ সূরাতুল লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ্ তায়ালার নামের সহিত আরম্ভ করছি। যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ه مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ه سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ه وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ه فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ه

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

তাব্বাৎ ইয়াদা (হাতগুলি নষ্ঠ হোক) **আবী লাহাবেঁও** (আবু লাহাবের) **ওয়াতাব্বা** (সে নিজো) **মা'আগনা** (যা উপার্জন করেছে) **আনহু মালোহু** (তাহার ধনসম্পদ) **ওয়া মা কাসাব** (তাহার জন্য যাহা যথেষ্ঠ) **সা ইয়াসলা নারানজাতা** (শীমূই শিক্ষা বিশিষ্ঠ নরকে প্রকাশ করিবে) **লাহাবেঁও** (আবু লাহাব) **আমরাআতুহ** (এবং তার স্ত্রী) **হাম্মা লাতাল হাতাবে** (জ্বালানী বহন করতো / অর্থাৎ হুজুর (সাঃ) কে কষ্ঠ দেবার জন্য ঈমান জগতে) **ফি জীদেহা** (তাহার গলাতে) **হাবলোম মিম মাসাদ** (খেজুর ডালের দড়ি)।

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ্ তায়ালার নামের সহিত আরম্ভ করছি যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ه اَللّٰهُ الصَّمَدُ ه لَمْ يَلِدْ ه وَلَمْ يُوْلَدْ ه وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ه

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

কুল (বল) **হুয়া** (তিনি) **আল্লাহো** (আল্লাহ) **আহাদ** (একমাত্র বা অদ্বিতীয়) **আল্লাহুস সামাদ** (আল্লাহ্ আত্মনিউরশীল অর্থাৎ আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন) **লাম ইয়ালেদ** (তাঁর কোন সন্তান সন্ততি নাই) **ওয়া লাম ইউলাদ** (এবং তিনি কারও সন্তান নন) **ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু** (এবং তাঁর মত কেহুই হতে পারে না) **কুফুওয়ান আহাদ** (তিনি একক সমতুল)।

سُوْرَةُ الْفَلَقِ সূরাতুল ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ্ তায়ালার নামের সহিত আরম্ভ করছি যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ه مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ه وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ه وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ه وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ه

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

কুল (বলুন হে মোহাম্মদ (সাঃ) **আয়ুযো** (আশ্রয় চাইছি) **বে রাব্বিল ফালাক** (উষা কালের আল্লাহের / বিশ্ব প্রকৃতির শ্রেষ্টা ও প্রতিপালকের কাছে) **মিন শাররে মা খালাকা** (তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট হতে) **ওয়া মিন শাররে গাসেক্কিন** (এবং অন্ধকারের খারপ বা অনিষ্ট হতে) **ইযা ওয়াক্কাব** (যখন ইহা আচ্ছন্ন হয়) **ওয়ামিন শাররিন্ নাফফাশাতে** (এবং যাদু কারিনীর যাদু হতে) **ফিল য়োক্কাদে** (গীরার বন্ধনে) **ওয়ামিন শার্‌রে হাসেদিন** (এবং সমস্ত রকম হিংসা হতে) **এযা হাশাদ** (যখন হিংসা করে)।

سُوْرَةُ النَّاسِ সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ তায়ালার নামের সহিত আরম্ভ করছি যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ه مَلِكِ النَّاسِ ه اِلٰهِ النَّاسِ ه مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ه الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ه مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ه

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

কুল (বলুন হে মোহাম্মদ (সাঃ) **আউজো** (আশ্রয় চাইছি) **বিরাব্বিন্নাস** (মানুষের প্রতি পালকের কাছে) **মালে কিন্নাস** / মানুষের প্রতিপালক) **এলাহিন্নাস** (মানুষের উপাসের কাছ) **মিন শার্‌রীল ওয়াস ওয়াসিল** (কুমন্ত্রনা কু ইচ্ছা হতে) **খাননাস** (আত্ম গোপন কারী শয়তানের) **আল্লাজী ইউওয়াসবেসো** (যারা প্রারথনা দেয়) **ফী সোদুরিন্নাস** (মানুষের অন্তরে) **মিনাল জিন্নাতে** (জিনেদের হইতে) **ওয়ান্নাস** (এবং মানুষ হতে)।

নামাজের নিয়ত সমূহ

মাগরীবের নামাজঃ-

(১) তিন রাকাত ফরজ (২) দুই রাকাত সুন্নাত্ (৩) দুই রাকাত নফল।

তিন রাকাত ফরজ নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ও অর্থঃ-

নাওয়াইতু আন (আমি নিয়ত করছি যে) **উসল্লিয়া** (নামাজ পড়ছি) **লিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **সালাসা রাকাতে সালাতিল মাগরেবে** (তিন রাকাত নামাজ মাগরেবের) **ফারজুল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার ফরজ / অবশ্যই করনীয়) **মোতাওয়াজ্জেহান** (মুখ ফিরিয়েছি) **এলা জেহাতিল কা বাতিশ সারিফাতে** (কাবা শরীফের দিকে) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের নিয়তঃ-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **রাকাতায় সালাতিল মাগরেবে** (দুই রাকাত মাগরেবের নামাজ) **সুন্নাতে রাসূলিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল (সাঃ)এর সুন্নাত) **মোতাওয়াজ্জেহান** (আমি মুখ ফিরিয়েছি) **এলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতে** (কাবা শরীফের দিকে) **আল্লাহো আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

দুই রাকাত নফল নামাজের নিয়তঃ-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **রাকাতাই সালাতিল নাফলে** (দুই রাকাত নফল নামাজের) **মোতা ওয়াজ্জেহান** (মুখ ফিরিয়াছি)**এলা জেহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতে** (কাবা শরীফের দিক) **আল্লাহো আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

এশার নামাজঃ-

এশার নামাজ মোট ১৭ রাকাত। তার মধ্যে প্রথম চার রাকাত সুন্নাতে গায়ার মোয়াক্কেদা (পড়ার খুবই সওয়াব না পড়াল দোষ নেই) তারপর ৪ রাকাত ফরজ, ২ রাকাত সুন্নাতে মোয়াক্কেদা (অবশ্যই পড়তে হবে) তারপর ২ রাকাত নফল ও পরে ৩ রাকাত বিতের ও ২ রাকাত নফল শেষ্য। মোট দুই বার নিয়ত করতে হবে।

(১) এশার চার রাকাত (প্রথম) সুন্নতে নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি) আল্লাহ তায়ালার জন্য)। **আরবায়া রাকায়াতে** (চার রাকাত) **সালাতিল এশায়ে** (এশার নামাজের) **সুন্নাতে রাসূলিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের সুন্নাত) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতে** (কাবা শরীফের দিকে মুখ করছি) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ মহান)।

(২) এশার চার রাকাত ফরজ নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ তায়ালার জন্য) **আরবায়া রাকয়াতে** (চার রাকাত) **সালাতাল এশায়ে** (এশ্বার নামাজের) **ফারজুল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহর ফরজ নামাজ) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শরিফাতে** (মুখ ফিরিয়াহ কাবা শরীফের দিক) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ মহান)।

(৩) এশার দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **রাকায়তা সালাতিল এশায়ে** (দুই রাকাত এশ্বার নামাজ) **সুন্নাতে রাসূলিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের সুন্নাত) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শরিফাতে** (মুখ ফিরিয়াছি কাবা শরীফের দিকে) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

(৪) এশার দুই রাকাত নফল নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **রাকাতাই সালাতিল নফলে** (দুই রাকাত নফল নামাজের) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শরিফাতে** (মুখ ফিরিয়াছি কাবা শরীফের দিকে) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

(৫) তিন রাকাত বেতের নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **সালাসা রাকায়াতে সালাতিল বিতরে** (তিন রাকাত বিতের নামাজের) **ওয়াজেবুল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার ওয়াজেব) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতে** (মুখ ফিরিয়াছি কাবা শরীফের দিকে) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

বেতের নামাজের পর দুই রাকাত নফল নামাজের নিয়তঃ

(৬) নফল নামাজের নিয়ত আগে যেমন ভাবে বলা হয়েচে সেই ভাবেই-

ফজরের নামাজ

ফজরের নামাজ মোট চার রাকাত। (১) প্রথমে দুই রাকাত সুন্নাত ও পরে দুই রাকাত ফরজ। মোট দুই বার নিয়ত করতে হবে।

(১) ফজরের নামাজে দুই রাকাত সুন্নাতের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةُ رَسُوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **রাকাতাই সালাতিল ফজরে** (দুই রাকাত ফজরের নামাজ) **সুন্নাতে রাসূলিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতে** (কাবা শরীফের দিকে মুখ ফরিয়ে) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

(২) দুই রাকাত ফরজ নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তাআলা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **রাকাতই সালাতিল ফজরে** (দুই রাকাত ফরজ নামাজের জন্য) **ফারজুল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার ফরয) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতে** (কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়েছি) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

জোহরের নামাজ

জোহরের মোট ১২ (বার) রাকাত নামাজ (১) প্রথম চার রাকাত সুন্নাত (২) পরে চার রাকাত ফরজ এরপর (৩) দুই রাকাত সুন্নাত শেষে (৪) দুই রাকাত নফল। মোট চার বার নিয়ত করতে হবে।

(১) জেহরের চার রাকাত সুন্নাত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **আরবা রাকায়াতে সালাতিল জোহরে** (জোহরের চার রাকাত নামাজের) **সুন্নাত রাসূলিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার

রাসূলের সুন্নাত) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতে** (কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

(২) চার রাকাত ফরজ নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

প্রায় একই রকম সামান্য রদবদল। সুন্নাতের পরিবর্তে ফরজ বলা।

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আরবায়া রাকায়াতে সালাতিল জোহরে (এর পরে সুন্নাত না বলে বলুন) **ফারজুল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতে আল্লাহ্ আকবার।**

(৩)পরে দুই রাকাত সুন্নাত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

সুন্নাত নামাজে যেমন নিয়ত করেছেন প্রায় একই রকম শুধুমাত্র আরবায়া রাকাতে না বলে বলুন রাকায়তা-

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকাতায় সালাতিল জোহরে সুন্নাতে রাসূলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতে আল্লাহ্ আকবার।

(৪) শেষ দুই রাকাত নফল নামাজের নিয়তঃ

ইহা একই কোন পরিবর্তন নেই (নফল নামাজের নিয়ত সব সময়ই একই হবে)।

আসরের নামাজ

আসরের নামাজ মোট আট (৮) রাকাত চার রাকাত সুন্নাতে গায়রে মোয়াক্কেদা ইহা পড়লে সওয়াব বেশী না পড়লে দোষ নেই। আর চার রাকাত ফরজ।

(১) নিয়তে অন্য চার ওয়াক্তের সুন্নাত নামাজ যেমন বলেছেন ঠিক সেই রকম শুধুমাত্র ওয়াক্তের নাম বদলাবেন যেমন জোহরের নামাজ বলেছেন আরবায়া রাকায়াতে সালাতিল জোহ্রে এখানে জোহরে কথার বদলে বলবেন আসরে- বাকি সবটা একই-

(২) আসরের চার রাকাত ফরজ নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ
فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আসরের ফরজ নামাজ জোহরের ফরজ নামাজের মতই। শুধু সালাতিল জোহরে না বলে বলুন সালাতিল আসরে)।

এছাড়া সপ্তোহিক নামাজঃ-

'জুময়া' জুময়ার নামাজ মোট ১৮ আঠার রাকাত যেমনঃ-

(১) দুই রাকাত তাহী ইয়াতুল অজু
(২) দুই রাকাত দোখুলিল মসজিদ
(৩) কাবলে জুময়া চার রাকাত
(৪) এমামের সাথে ফরজ দুই রাকাত
(৫)বায়াদাল জুমা চার রাকাত
(৬) সুন্নাত ওয়াক্ত দুই রাকাত
(৭) দুই রাকাত নফল

(১) তাহী ইয়াতুল ওজু-নামাজের নিয়ত-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةُ الْوُضُوْءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে আমি নামাজ পড়ছি আল্লাহ্র জন্য) **রাকাতায় সালাতিল তাহীয়াতুল অজুয়ে** (দুই রাকাত অজুর দোয়ার নামাজ) **সুন্নাতে রাসূলিল্লাহে তায়ালা** (আলল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের সুন্নাত) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতে** (কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়েছি) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

(২) দুই রাকাত দোখুলিল মসজিদ নামাজের নিয়তঃ-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **রাকাতায় সালাতিল দোখুলিল মাসজিদে** (দোখুলিল মসজিদে দুই রাকাত নামাজ) **সুন্নাতে রাসূলিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের সুন্নাত) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতে** (কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়াছি) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

(৩) চার রাকাত কবেলেল জুমার নিয়ত-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **আরবায়ী রাকাতায় সালাতিল কাবালাল জুমায়াতে** (চার রাকাত কাবালাল জুমার নামাজ) **সুন্নাতে রাসূলিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের সুন্নাত) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতে** (কাবা শরীফের দিক মুখ ফিরিয়াছি) **আল্লাহ্ আবার** (আল্লাহ্ মহান)।

এরপর (৪) এমামের সাথে দুই রাকাত ফরজ নামাজের নিয়ত-

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَآءِ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন (আমি নিয়ত করছি যে) **ওসকেতা** (মুক্তি দাওয়র জন্য) **আন** (মাহা) **জিম্মাতি** (আমার উপর জিম্মাদারী) **ফারজে জোহরে** (জোহরের ফরজ) **এর আদায়ে** (আদায়ের মাধ্যমে) **রাকাতো সালাতিল** (দুই রাকাত নামাজ) **জুমুয়াতে** (জুমার) **ফারজুল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার ফরজ) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবা তিশ শারীফাতে** (কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়াছি) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

(৫) চার রাকাত বাদাল জুমার নিয়তঃ-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **আরবায়া রাকাতে** (চার রাকাত) **সালাতিল বাদাল জুমুয়াতে** (বাদাল জোমার নামাজের) **সুন্নাতে রাসূলিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের সুন্নাতে) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতে আল্লাহ্ আকবার** (কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে, আল্লাহ্ মহান)।

দুই রাকাত সুন্নাতোল ওয়াক্ত নামাজের নিয়েতঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ سُنَّةُ الْوَقْتِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ্র জন্য) **রাকায়াতায় সালাতিল সুন্নাতে ওয়াক্ত** (দুই রাকাত ওয়াক্তের সুন্নাত নামাজ) **রাসূলিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতে** (কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়াছি) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

দুই রাকাত নফল নামাজঃ-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

তারাবীর নামাজ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيح سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে আমি নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালর জন্য) **রাকাতাই সালাতিল তারাবীহ**

(দুই রাকাত তারাবীর নামাজ) **সুন্নাতে রাসূলিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার রাসূলের সুন্নাত) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতে** (কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়াছি) **আল্লাহু আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

নামাজের দুই রাকাত বা চার রাকাতের সালাম ফিরবার পর দোওয়া বা তশবীহ।

দোওয়াঃ

سُبحَانَ ذِىُ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ۔ سُبحَانَ ذِىُ الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبحَانَ الْمُلْكِ الْحَيِّ الَّذِىُ لَايَنَامُ وَلايَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا۔ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ۔

সোবহানা জিল মোলকে অল মালাকুতে (প্রশংসা শুধু লোকের ও অবশ্য লোকের বাদশাহ্ যিনি) **সোবহানা জিল এজ্জাতে অল আজমাতে** (মনে ও সম্ভ্রমের অধিপতি) **অল হায়বাতে অল কুদরাতে** (ও যিনি এশে সাক্ষারক ও ক্ষমতাবান) **অল কিবরিয়ায়ে অল জাবারুতে** (যিনি গৌরবাপিত ও যিনি প্রবল প্রতাপশীল) **সোবহানাল মালাকেন হাইয়েল্লাজী** (আমি তাহারই প্রশংসা করি যিনি আয়ুদান করেন বা সদা জীবিত) **লা ইয়ানামু** (কখনই মরিবেন না) **আবাদান আবাদান** (অনন্তকাল চিরদিন) **সুব্বেহুন কুদ্দুসুন** (পালন কর্তা ও প্রতিপালক) **রাব্বানা অ-রাব্বেল মালায়ে কাতো অররূহ** (আমাদের প্রভু এবং সমস্ত ফেরেস্তাতাদের ও সমস্ত আত্মার প্রতিপালক)।

তারাবীহ নামাজের মোনাজাতঃ-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَاخَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَاخَالِقُ يَابَارُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ۔

আল্লাহুম্মা ইন্না নাসয়ালুকাল জান্নাতা (আর আল্লাহ পাক আমি আপনার কাছে জান্নাতে কামনা করিছি) **অনাউজোবেকা মিন্নার** (এবং আপনার কাছে দোযখের আগুন হোক অব্যহিত চাইছি) **ইয়া খালকার জান্নাতে অন্নার**(ও জান্নাত ও দোযখের সৃষ্ঠি কর্তা) **বে রেহমাতেকা** (আপনার রহমতের দ্বারা) **ইয়া আজিজা** (হে প্রবল পরাক্রমশীল বনুব) **ইয়া গাফফারো** (হে ক্ষমাকারী) **ইয়া কারীমো** (হে দয়াময়) **ইয়া সাত্তারো** (হে দোষ ছুটি গোপনকারী) **ইয়া রাহীমো** (হে রহমকারী) **ইয়া জাব্বারো** (হে মহাশক্রিধর) **হুয়া মালেকো** (হে সৃষ্টি কর্তা) **হুয়া বাররো** (হে সৎকর্মশীল) **আল্লাহম্মা** (আয় আল্লাহ্) **আজেরানা মিন্নার** (আমাদের দোষমের আগুন হতে রক্ষা কর) **ইয়া মুজীরো ইয়া মুজীরো** (হে মুক্তিদাতা হে মুক্তিদাতা) **বেরাহমাতেকা** (আপনার রহমতের দ্বারা) **ইয়া আর রাহমান রাহেমীন** (হে পরম করুনাময়)।

ঈদের নামাজের তকবীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

আল্লাহো আকবার, আল্লাহো আকবার (আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ মহান) **লা এ ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** (তিনি বা আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) **ওয়াল্লাহু আকবার** (এবং আল্লাহ্ মহান) **আল্লাহু আকবার** (আল্লাহ্ মহান) **ওয়ালিল্লাহিল হামদ** (এবং আল্লাহ্ তায়ালার জন্যেই যাবতীয় প্রশংসা)।

ঈদের নামাজ পড়ার নিয়েত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা (আমি নিয়ত করছি যে নামাজ পড়ছি আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **রাকায়াতায় সালাতে ঈদেল ফিতর** (দুই রাকাত ঈদুল ফিতরের নামাজ / ঈদুল আজহা-ঈদুল আজহা) **মায়াশিত্তাতে তাকবিরাতে** (দুয় তকবীরের সাথে) **ওযাজেবুল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতে** (কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়াছি) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

জানাযার নামাজ

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ اَلْجَنَازَةِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا / لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ۔ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নাওয়াইতু আন উয়াদ্দিয়া (আমি নিয়ত করছি যে আমি আশ্রয়

চাইছি) **লিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ তায়ালার নিকট) **আরবায়া তাকবীরাতে** (চার তকবীরের সাথে) **সালাতিল জানাজাতে** (জানাজার নামাজের) **ফারজিল কেফাইয়াতে** (ফারাজ কেফাইয়া) **অস সানাও লিল্লাহে তায়ালা** (আল্লাহ তায়ালার সত্ততি) **অস সালাতো আলান নাবিইয়ে** (এবং নবী করিম (সাঃ) এর প্রতিদরূদ) **ওয়াদ দোয়াও লে হাজাল মাইয়েতে** (এই মৃত ব্যক্তির প্রতি দোওয়া) **মোতাওয়াজ্জেহান এলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতে** (কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে) **আল্লাহ্ আকবার** (আল্লাহ্ মহান)।

প্রথম তকবীর দিকে তহরীমা বেধে দোওয়া সানা-

سُبۡحٰنَکَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمۡدِكَ وَتَبَارَكَ اسۡمُکَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُکَ وَلَا اِلٰهَ غَيۡرُكَ ه

সোবহানাকা আল্লাহুম্মা, অ-বেহামদেকা, অ-তাবারাকস মুকা, অ-তায়ালা জাদ্দোকা, অ-জাল্লা সানাওকা, অলা-এলাহা গায়রুকা।

(হে আল্লাহ্ আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি) (এবং তোমারই প্রশংসা) (এবং তোমারই নামের বরকত), (এবং তোমারই মহানতা সর্বোচ্চ), এবং তোমারই সান অতিশ্রেষ্ঠ) (এবং তুমি কেহই উপাস্যনাই)।

দ্বিতীয় তকবীরের পর পড়তে হবে।

<u>বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-</u>

আল্লাহুম্মা স্বাললে (হে আল্লাহ অর্নুগ্রহ বা শান্তিদিন) **আলা মোহাম্মাদেঁও** (মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর) **ওয়া আলা আলে মোহাম্মাদিন** (মোহম্মদ (সাঃ) এর বংশধরগণের উপর) **কামা স্বাল্লাঈতা** (যেমন শান্তি বা অনুগ্রহ) **আলা ইব্রাহীমা** (আলায় হে স্বালাম এর উপর) **ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা** (এবং ইব্রাহীম আলায় হে সালাম -এর বংশধর গনের উপর) **ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ** (নিশ্চই আপনি প্রশংসিত ও মহান)।

তৃতীয়ো তকবীরের পরে পড়তে হবে।

اَللّٰهُمَّ اغۡفِرۡ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيۡرِنَا وَكَبِيۡرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنۡثَانَا۔اَللّٰهُمَّ مَنۡ اَحۡيَيۡتَهٗ مِنَّا فَاَحۡيِهٖ عَلَى الۡاِسۡلَامِ وَمَنۡ تَوَفَّيۡتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الۡاِيۡمَانِ بِرَحۡمَتِکَ يَااَرۡحَمَ الرَّحِمِيۡنَ ه

আল্লাহুম্মাগফের (আর আল্লাহ্ ক্ষমা কর) **লেহাইয়েনা** (আমাদের জীবিত ব্যক্তিদের) **ওয়া মাইয়েতনা** (এবং আমাদের মৃত ব্যক্তিদের) **ওয়া শাহীদেনা** (এবং যারা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে) **ওয়া গায়েবেনা** (এবং আমাদের মধ্যে যারা অনুপস্থিত) **ওয়া সাগীরেনা** (এবং আমাদের ছোটদের) **ওয়া কাবীরেনা** (এবং আমাদের বড়দের) **ওয়া জাকারেনা** (এবং আমাদের সকল পুরুষদের) **ওয়া উনসানা** (এবং আমাদের সকল মেয়েদের) **আল্লাহুম্মা মান আহয়াইতাহু** (আয় আল্লাহ্ জীবিত কালেন মধ্যে) **মিন্না ফাতাহয়াইহি** (যারা জীবিত আছে) **আলাল ইসলামে** (ইসলামের উপর) **ওয়া মান তাওয়াফই তাহু** (এবং যারা পরিপূর্ণ করেছে) **মিন্না ফাতাও য়াফফাহু** (তাহাদের পরিপূর্ণ তার মধ্যে) **আলাল ইমান** (ঈমানের উপর) **বেহ্রাহমাতেকা** (আপনার রহমতের দিয়ে) **ইয়া আরহামার রাহেমীন** (হে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ কারী)। চতুর্থ তকবীরের পর হাথ খুলে দুই দিকে সালাম ফিরাতে হবে।

কোরবানীর দোওয়া

اِنِّیۡ وَجَّهۡتُ وَجۡهِیَ لِلَّذِیۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ حَنِيۡفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ۔ اِنَّ صَلٰوتِیۡ وَنُسُكِیۡ وَمَحۡيَایَ وَمَمَاتِیۡ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ لَاشَرِيۡکَ لَهٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرۡتُ وَاَنَا مِنَ الۡمُسۡلِمِيۡنَ ۔ اَللّٰهُمَّ مِنۡکَ وَلَکَ بِسۡمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اَكۡبَرُ

ইন্নি ওয়াজ্জাহতু (নিশ্চয়ই আমি মুখ ফিরিয়াছি বা মুখ করিয়াছি) **ওয়াজ হিইয়া লিল্লাজি** (ঐ আল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়াছি) **ফাতারাস সামাওয়াতে ওয়াল আরদা** (যিনি আকাশ ও মাটি বা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন) **হানীফাও** (একাগ্রচিত্তে বা একমান) **ওয়া মাআনা মিনাল মুশারকীন** (এবং আমি নিশ্চয়ই মোশরেক বা শিরককারীদের বা শিরককারীদের মধ্যে নর) **ইন্নাস, সালাতি** (নিশ্চয়ই আমার নামাজ) **ওয়ানা সোকি** (এবং আমার কোরবানী) **ওয়া মাহইয়া** (এবং আমার হায়াত বা জীবন) **ওয়া মামাতি** (এবং আমার মৃত্যু) **লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন** (আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক) **লা শারিকালাহু** (তাদের কোন শরীক বা অংশী নেই) **ওয়াবেজালেকা** (এবং ওতে) **আমিরতো** (আমি আদেশ দেয়েছি) **ওয়া আনা মিনাল মোসালমিন** (এবং আমি মোসলমানদের মধ্যেই) **আল্লাহুম্মা মিনকা** (আয় আল্লাহ আমি তোমারই হতে) **ওয়ালাকা** (এবং তোমারই জন্য)। **বিস্মিল্লাহে আল্লাহো আকবার** (আল্লাহর নামের সাথে। আল্লাহ্ মহান।

দোওয়া

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّى كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ ه

আল্লাহুম্মা (আয় আল্লাহ্) **তাকাব্বালাহু মিননি** (তার থেকে যেমন কুবুল করেছেন-আমার থেকেও) **কামা তাকাব্বালতা মিন খালীলেকা** (যেমন কবুল করেছেন আপনার প্রিয় বন্দুর থেকে) **ইব্রাহীমা** (ইব্রাহীম (আঃ) থেকে) **ওয়া হাবীবেকা মোহাম্মাদিন** (এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধ মোহাম্মদ (সাঃ) থেকে) **আলাইহেমাস** (তাহাদের উপর থেকে কাছ থেকে) **সালাতো ওয়াস সালাম** (নামাজ, সালাম ও কোরবানী)।

অপর জনের জন্য জবেহ করলে তাহাদের নাম বলে এবং যদি সে একজন পুরুষ হয় তবে মিননি **مِنِّىْ** এর জায়গায় বলবেন মিনহু **مِنْهُ** এবং যদি দুইজন হয় তবে **مِنْهُمَا** মিনহুমা এবং দুই এর বেশি হলে **مِنْهُمْ** মিনহুম। যদি একজন স্ত্রীলোক হয় **مِنْهَا** তবে মিনহা দুইজন হোলে **مِنْهُمَا** মিনহুমা আর বেশি হোলে **مِنْهُنَّ** মিনহুন্না। এবং পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে মিলে হয় তবে **مِنْهُمَا** ও **مِنْهُمْ** বলবে।

রোজা কাকে বলে?

ইসলামি বছরের নবম মাস রমজান / রমদ্বান **رَمَضَانَ** এই মাসের প্রথম দিন থেকে ষাওয়াল **شَوَّالُ** মাসের চাঁদ দেখা পর্যন্ত এই ৩০ দিন বা ২৯ দিনের প্রতিদিন শুবহে স্বাদেকের আগের সময় থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত এবাদতের উদ্দেশ্যে পানাহার খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে ছয় রিপুর বা নফসের সংযম পালনের নাম রোজা বা স্বোওম **صُوْمٌ** বলে।

রোজা ইশলামের তৃতীয় রোকন ইসলাম রূপ অট্টালিকার পাঁচ স্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভ। এর আক্ষরিক অর্থ উপবাস। কিন্তু ভাবগত অর্থ হল সংযম পালন। মানুষ অনেক সময়েই ছয় রিপুর বশীভূত হয়ে বা নফসের গোলাম হয়ে অনেক খারাপ কাজ করে বা করতে প্রবৃত্ত হয়। তাই মানুষ সারাদিন অর্থাৎ উল্লেখিত সময়ে সুবহের স্বাদেকের আগে থেকে সারাদিন অর্থাৎ মাগরীব পর্যন্ত উপবাসে থেকে বা পানাহার ত্যাগ করে যদি নফসের বা ছয় রিপুর গোলাম হয়ে সমস্ত রকম খারাপ কাজ করে তা হলে তা রোজা **صُوْمٌ** পালন হবে না। রোজা পালন করতে গেলে ঐ উপবাসের সাথে ছয় রিপুর সংযম পালন ও সৎকাজ দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার নৈকটা লাভের আশায় উপবাসের কষ্ট উপলব্ধি করা তবেই হবে রোজা পালন বা **صُوْمٌ** পালন।

রোজা

রোজা বা **صُوْمٌ** আল্লাহ্ তায়ালা-আমাদের ফরজ করেছেন। হাদীস শরীফে আছে-আদম সন্তানের অন্যান্য সমস্ত আমলের শওয়াব দশগুণ থেকে শত শত গুণ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। 'রোজা কিন্তু সেরকম নয়। কেননা কোন প্রকার রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো ছাড়া কেবল মাত্র আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই রোজা রাখা হয়। তাই আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই এবং নিজ হাতেই রোজার জন্য বিশেষ পুরুস্কার দিবেন। আল্লাহ্ পাক বলেছেন রোজাদার তাহার রিপুর পরিচালনা বা নফসের পরিচালন এবং পানাহার শুধুমাত্র আমরই খাতিরে ত্যাগ করে থাকে। আবার হাদীশ পাকে এও বলা আছে যে রমজান / রমদ্বান মাস অতি পবিত্র ও সম্মানীত মাস। এমাসে বেহেশ্তের দরজা সকল খোলা থাকে। পক্ষান্তরে দোজখের সমস্ত দরজা বন্ধ থাকে। এ মাসের একটি রাত আছে যা হাজার হাজার মাসের রাত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি এমাসে কোন পূণ্য কাজ করে না তার জন্য কোন পুরস্কার নেই বা এমাসে যে পূণ্য কাজ করে তার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা প্রচুর শওয়াব রেখেছেন। আবার এটাও বলা আছে এই রমজান / রমদ্বান মাসে আল্লাহ্ পাক শয়তানদেন বেঁধে রাখেন তারা তাঁর অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের বান্দাদের কোন প্রকার প্ররোচনা দিয়ে বিপথে চালাতে পারে না। আবার ইফতার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশেষ আনুগত্য। কত রকমের ইফতারের খাবার সাজিয়ে অতি ক্ষুধার্ত অবস্থায় থেকেও আল্লাহ্ পাকের আদেশের বা আজান শোনার অপক্ষায় বসে থাকতে হয়। এতে আল্লাহ্ পাকের প্রতি এক চরম আনুগত্য প্রকাশ পায়।

এফ্‌তারের নিয়েতঃ-

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ه

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

আল্লাহুম্মা (আয় আল্লাহ্) **স্বুমতো লাকা** (আপনার রোজা আমি রেখেছি) **ওয়া তাওয়াক্কালতো** (এবং আমি নির্ভর করেছি)**আলা-রিযক্কেকা** (আপনার রিজেকের উপর) **ওয়া আফ তার তো** (এবং এফ তার করছি) **বে রাহ্‌মাতেকা** (আপনার দয়ার সাথে)**ইয়া আরহামার রাহেমিন বিসমিল্লাহির রহামনির রাহীম** (পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহ্ তায়ালার নামের সাথে)।

শেহরী

রোজা রাখার বাসনায় বা ইচ্ছায় রাত্রি দ্বিপ্রহরের শেষে সুবহে কাজেবে বা সুবহে স্বাদেকের আগে যে পানাহার করা হয় তাকে 'শেহরী' বলে। রাত্রির শেষভাগে অর্থাৎ সুবহে স্বাদেকের আগে শেহরী খাওয়া বা শেহরী শেষ করা দরকার। অনেক আগে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরেই শেহরী খাওয়া ঠিক নয়। এমন সময়ে শেহরী শেষ করতে হয় যেন এর ৩০ / ৪০ মিনিচের মধ্যেই ফজরের ওয়াক্ত হয়। বা ফজর ওয়াক্তের ৩০ / ৪০ মিনিট আগেই শেহরী শেষ করা অতি উত্তম। এই সময় শেহরী শেষে উপকারীতা এই যে শেহরীর পর একেবারে ফজরের নামাজ আদায় হয়ে যায়। অন্যথায় শেহরী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে ফজরের নামাজ ক্বাজা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

রোজার নিয়েতঃ-

শেহরী খাওয়ার পরই নিয়ত করা দরকার। তবে সূর্য ওঠার আগেই রোজার নিয়েত করা একান্ত দরকার। অন্যথায় রোজা শুদ্ধ হবে না। কারো কারো মতে রোজার উদ্দেশ্য রাত্রি শেষে উঠে যে শেহরী বা পানাহার করা হয় তাতেই রোজার নিয়েত করা হয়ে যায়। তবে মৌখিক ভাবে রোজার নিয়েত করা খুবই ভাল।

রমদ্বান মাসের রোজার নিয়েতঃ-

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًالَّكَ يَا اللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

নাওয়াইতু আন (আমি নিশ্চই নিয়েত করছি) **আসুমা গাদান** (আগামী কালের রোজা বা উপবাস) **মিন শাহরে রমদ্বানাল মোবারাকে** (বরকত পূর্ণ রমজান মাসে) **ফারদল্লাকো** (এবং আপনার ফরয) **ইয়া আল্লাহো ফাতাক্কাব্‌বেল মিন্‌নি** (আয় আল্লাহ্ আমার পক্ষ থেকে কবুল কর) **আনতাশ শামিয়ুল আলীম** (নিশ্চয়ই তুমি শ্রেষ্ঠ শ্রবণ কারী)।

যদি সকালে সূর্য ওঠার পর বা অসাবধানতা বসতঃ ফজর কাজা হয় এবং সূর্য ওঠার পর নিয়ত করতে হয় তবে নিয়েতে **اَصُوْمَ غَدًا** আসুমা গাদান না বলে বলুন **اَصُوْمَ اَلْيَوْمُ** আল ঈয়াওম্।

রমদ্বান মাসে ওজর বশতঃ রোজা ক্বাজা হয় তবে ক্বাজা রোজা আদায় করতে এই ভাবে নিয়েত করতে হয় যথাঃ-

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ عَنْ ذِمَّتِىْ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ بِاَدَآءِ غَدًا فَرْضً

لَكَ يَا اللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

নাওয়াইতু আন (আমি নিশ্চই নিয়েত করছি) **আসুমা** (আমি রোজা রাখছি) **যান যেম্‌মতি** (যাহা আমার জন্য জিম্মাদারী আছে) **রমদ্বানাল মোবারাকে** (মহা বরকতপূর্ণ রমজানের) **ওয়া ফারদ্বুলাকা** (এবং তোমার / তুমী আল্লাহ্‌র ফরজ) **ঈয়া আল্লাহো ফাতাক্কাব্বাল** (ইয়া আল্লাহ্ কবুল করেন/মেনে নিও) **মিন্‌নি** (আমার থেকে) **আনতাস শামীয়ুল আলীম** (তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রবণকারী বিজ্ঞময়)

রমদ্বান মাস ছাড়া আরও কিছু কিছু দিন রোজা রাখা হয়। যাহা নফল রোজা বলা হয়। যেমন শবে বরাত, শবে মেরাজ, আঈয়ামে বীজ বা প্রতি চাঁদের তেরই, চোদ্দও পনরই তারিখে, মোহার্‌রমের নয় এবং দশ তারিখ, শওয়াল মাসের যে কোন ছয় দিন পহেলা শওয়াল বাদ দিয়ে। স্বত্তমে দাউদী বা একদিন অন্তর একদিন রোজা রাখা নফল বা অতিরিক্ত। এই সকল রোজা পালনে খুব বেশি সওয়াব, এবং গুনাহ মাফ হয়। কিন্তু না করলে ক্ষতি নেই।

এই রূপ নফল রোজার নিয়তঃ-

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِنْ مُبَارَكِ الْاَيَّامِ. يَا اللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

বাংলা উচ্চারণ ও অর্থঃ-

নাওয়াঈতো (আমি নিয়েত করছি) **আস্বুমা গাদান** (আগামী কাল আমি রোজা রাখছি) **মিন মোবারাকাল আঈ ঈয়ানে** (আঈ ঈয়ানে (পরম বরকতময় দিনগুলির থেকে) **ঈয়া আল্লাহো ফাতাকাববাল** (অতএব আল্লাহ্ পাক ইহা কবুল করুন) **মিন্নি** (আমার থেকে)

ইন্নাকা আনতাশ্ সামীয়ুল য়ালীম (আমনি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রবণকারী ও বিজ্ঞময়)।

যাকাত الزَّكٰوة

যাকাত ইসলাম ধর্মের চতুর্থ স্তম্ভ। যাকাত শব্দটির অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি যার সাধারণ অর্থ শুদ্ধিকরণ। ইসলামি গ্রন্থ সমূহে যাকাত শব্দ এই রূপ অর্থে ব্যবহার থাকে। যাকাত-যাকাত দাতাকে পাপ ও কৃপনতা থেকে পবিত্র করে। ধনসম্পদের কিয়দংশ ব্যায় দ্বারা অবশিষ্ট ধনসম্পদ পবিত্র হয়। রাসুলে আকরাম (সঃ) সম্বোধন করে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন তাদের ধনসম্পদ থেকে সাদকা আদায় করে, ইহা দ্বারা তুমি তাহাদের পবিত্র করে দিবে। আল কুরআন সূরা রুম- ৩০ আয়াত ৩৮ / ৩৯ যাকাতের ফল সরুপ ধন সম্পদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ এর সন্তুষ্টির জন্য যারা যাকাত দান করে। তাহাদেরই ধনসম্পদ বৃদ্ধি হয়। যাকাত দ্বারা মানুষ আত্মসুদ্ধি লাভ করে। কুরান ও হাদীশের ভাষায় ধনসম্পদ যে নির্ধারিত অংশ আল্লাহর পথে ব্যায় করা একান্ত কর্তব্য তাকেই যাকাত বলে। যদি কারও কাছে সাড়ে সাত তোলা (ভরি) সোনা বা সাড়ে বাহান্ন ভরি রূপা বা সেই পরিমান মূল্যের অর্থ এক বছরের সংসার খরচ বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত থাকে তবে ওই ব্যক্তিকে সাহেবে নেসাব বা শাস্ত্র সম্মত ধনী বলে। আর সাহেবের নেশাব ব্যক্তির জন্য জাকাত আদায় ফরয। এতে সাহেবে নেশাব ব্যক্তির গোনাহ মাফ হয় এবং তার অর্থ বা সম্পদ পরিশুদ্ধ হয়। সাহেবে নেশাব ব্যক্তির জন্য যাকাত উদ্ধৃত্ত ধনের বা সম্পদের ৪০ ভাগের এক ভাগ বা একশতের ২.৫ আড়াই ভাগ অংশ যাকাত দেওযা একান্ত ফরয। সোনা বা রূপাকে শোধন করতে গেলে যেমন তারা খাদ বাদ দিতে হয়, তেমনই সাহেব নেশাব ব্যক্তির সম্পদ পরিশুদ্ধ করতে হলে যাকাত অবশ্যই দিতে হয়।

যাকাত সম্পর্কে কোরআন শরীফে সরাসরি ঘোষনা আছে ৮২ জায়াগায়। যেমন তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করও যাকাত দাও এছাড়াও যাকাতের ঘোষনা শুরাবাকারাহ ২, ২, ৩১৫ (২.২৩.১৫) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ তোমরা যদি প্রকাশ্য দান কর, তবে তা ভাল। আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভাল, এবং এতে তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপমোচন করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তাহা সবই অবগত (বাকারাহ হয় পারা ২৭১ আয়াত)।

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ যাকাত আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই। তাই আল্লাহর রহমতের জন্য ও বা নিজেদের গোনাহ মোচনের জন্য আল্লাহর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য যাকাত দেওয়া প্রয়োজন তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ (২.২০.২৭২) তোমরা যা কিছু দান কর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই তা কর। আবার হাদীশ পাকে আছে, যাকাত না আদায় করলে আল্লাহ পাক কবূল করেন না। (সগির) জাকাত আদায়ের মধ্যেই ইসলামের পূর্নতা (সগির) কোরআন শরীফের আরও ঘোষনা লাতুনফেকু ।

মেম্মা তোহেব্বুন তোমরা যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহ্র রাস্তায় দান না কর ততক্ষণ তোমরা বিশ্বাসী হবে না। (আল ইমরান)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (২.২৫.৯২) ৯২ আবার শুরু হা মিম শজট্রহ اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (২২.২১৫.৭) ৪১ পারা ২৪ আয়াত ৭ এ আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করছেন-যারা যাকাত প্রদান করে না ওরা শেষে/পরকালে কাফেরদের মধ্যে থাকবে। যেহেতু আল্লাহ্ পাক ক্বোরআন শরীফে ৮১ বার, وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ কারো কারো মতে ৮২ বার তাগিদ দিয়াছেন। তাই যেমন নামাজ আদায় করা অবশ্যই কর্তব্য সেই রূপ

যাকাত আদায় করা ও একান্ত কর্তব্য। নামাজ যেমন সকলের অবশ্যক সেইরূপ যাকাতও সকলের অবশ্যকীয়। আমরা সাধারণত বুঝি, যাকাত শুধু বিত্তবান বা যারা সাহেবে নেসাব তারাই শুধু যাকাত দিবেন। যাকাতের ব্যপক অর্থ ধরলে এই টাই হয়। সমস্ত সম্পদ তথা মানুষ হিসাবে বা ইনসান হিসাবে জীবন ধারণ করতে যা কিছু প্রয়োজন সবই সম্পদ। টাকা, পয়সা, বুদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞান শক্তি সবই সম্পদ অতএব এই সকল সম্পদের যাকাত প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। বিত্তবানরা বিত্তের মাধ্যমে যাকাত প্রদান করিবেন, নিশ্চই কর্তব্য। কিন্তু যারা বিত্তবান নয় এমন ব্যক্তির ও যাকাত প্রয়োজন। এমন ব্যক্তির আছে এই সম্পদ যথা বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক, শক্তি ইত্যাদি অতএব এই সম্পদ দিয়েই তারা যাকাত প্রদান করিবেন। জানবেন রাস্তার উপর একটা ইটের টুকরো সরিয়ে দিয়েও যাকাত আদায় করা যায়। অন্ধের হাত ধরে রাস্তা পার করে দেওয়া ও যাকাত। আবার শুরা আনআম ১৪১ নং আয়তে ৮ পারা ১৭ রুকু।

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ
وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْ حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ (٨_٢٥_١٢١)

তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খেজুর বৃক্ষ বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য শষ্য, জয়তুন ও দাড়িম্ব সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ গুলি একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশ ও যখন তা ফলবান হয় তখন ওর ফল আহার কর। আর ফসল কাটার দিন ওর তক আদায় কর। ইহার মর্ম এই যে সর্বপ্রকার উদ্যান জাত ও খেতোৎপন্ন ফল ও শস্য আল্লাহ্রই সৃষ্টি অতএব তোমরা উহা আনন্দ ও তৃপ্তির সহিত ভক্ষন কর, কিন্তু ফল আহরন এবং শস্যাদি কর্তনের দিন উহা হইতে নির্দিষ্ট অংশ বলতে যাকাত কেই বোঝায়। যাকাত প্রাপক বা হকদার শুরা রূম (৩০) আয়াত ৩৮ পারা ২১এ অধ্যায় فَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَبِيلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٢١_٣٠٥_٣٨) অতএব আত্মীয় স্বজনকে, অভাবগ্রস্ত এবং পথের কাঙালকে তাদের প্রাপ্য দেবে, এবং যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য শ্রেয় এবং তারাই সফল কাম। অতএব ইহাতে বোধগম্য হয় নিকটতম গবীর আত্মীয় স্বজন, এতিম মিসকিন, ফকির, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ঋনগ্রস্ত ব্যক্তি মূসাফির এবং যারা বিত্তবান নয় তারাই যাকাতের হক দ্বার। আবার সূরা ৯ পারা ১১ এবং আয়াত ৬০-

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالمِسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ
وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِضَةً مِنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (١١_٩٥_٢٠)

দান খায়রাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও সংলিষ্ট কর্মচারীদের জন্য যাদের মনকে অনুরাগী করা অবশ্যক। তাদের জন্য দাস মুক্তির জন্য ঋনে ভারাক্রান্তদের জন্য আল্লাহর পথে সংগ্রামী ও পর্যটকদের জন্য এ আল্লার বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। সদকা, যাকাত খয়রাত, সৈয়দরা নিতে পারেন না।ওনাদেরকে নেওয়া নিষেধ আছে।

হাদীশ শরিফে আছে একবার রসূলে আকরম (সাঃ) সামনে সাহাবী কিছু খেজুর রাখলেন-তার থেকে ছোট এমাম হোসায়েন (আঃ) মাত্র একটা খেজুর তুলে মুখে দিয়ে দেন-তখন হুজুর পাক তাহা গলা থেকে আঙুল দিয়ে বার করে ফেলে দেন এবং বলেন এটা সদকা এর থেকে বোঝা যায় সৈয়দদের জন্য সদকা বা জাকাত গ্রহন যোগ্য নহে।

হজ্জ্ব

হজ্জ্ব ইসলামের বুনিয়াদের বা ইসলাম স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত অট্টালিকার পঞ্চম স্তম্ভ। হজ্ব সব্দের সাধারণ অর্থ তীর্থ ভ্রমন। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় বা শরীয়ৎ অনুসারে হজ্ব বলতে বোঝায় প্রবিত্র জীল হজ্ব মাসে সম্মানের সাথে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রবিত্র কাবা শরীফ জিয়াত করা বা তাওয়াফ করা। সাফা পাহাড় থেকে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত ৭ বার সায়ী করা মীনায় অবস্থান করা, আরাফাত ময়দান এ অবস্থান করা, মজাদালেফার মাঠে রাত কাটানো, জুমারায় কাঁকর ছুঁড়া এবং মীনায় কোরবানী করা, প্রভৃতি।

যেহেতু হজ্বের কাজটা ক্বাবাগৃহকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে তাই কাবাগৃহ সম্মন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার।

কা'বা শরীফ

পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম যে ঘর তৈরী হয় সেটাই কা'বা ঘর এবং কা'বা ঘরই সর্বপ্রথম উপাসনার জায়গা বা এবাদতের জায়গা। এর আগে কোন এবাদতের বা উপাসনা জন্য কোন ঘর তৈরী হয়নি বা বাসোপজোগী কোন ঘর তৈরী হয়নি। একারনেই হজরত অবদুল্লাহ বিন ওমর রাদি আল্লাহ্ তায়ালা আনহু মুজাহিদ। কাতাদাহ প্রমূখ মনীষীগন কাবাশরীফ সম্বন্ধে বলেছেন ইহাই বিশ্বের বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ঘর।

বায়হাক্বীতে আছে নবী করিম (সাঃ) বলেন হজরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)এর পৃথিবীতে আসার পর আল্লাহ পাক জিব্রাইলের দ্বারা কাবা শরীফ তৈরীর পর তাদেরকে তাওয়াফ করতে বলা হয়। আর ও বলা হয়, আপনি সর্বপ্রথম মানুষ এবং এ ঘর পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘরটা মানুষের জন্যই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। (ইবনে কাশীর)

আদম (আঃ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই কা'বা ঘর নূহ (আঃ)এর মহাপ্লাবনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর ইহা হজরত ইব্রাহীম (আঃ) পুনরায় নির্মান করেন। পরে এর প্রাচীর ধসে গেলে জুরহুম বংশের লোকেরা পুনরায় তৈরী করেন। এভাবে কয়েকবার বিধ্বস্ত হওয়ার আমালেকা বংশের লোকেরা ও একবার কুরাইশগন ইহা নির্মান করেন। সবার শেষে আমাদের প্রিয় নবী করীম (সাঃ)এর হস্তদ্বয়েরও বরকত ছিল। এবং তিনিই হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করেন।

হজ্ব কখন ফরয (ফরজ)

হজ্জ কখন থেকে ফরয হয়েছে এ সম্মবন্ধে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে নানা রকম মত আছে। কেউ বলেন হিজরতের পূর্বেই ফরয করা হয়েছে। ইমামে হাদীশ ওয়াকেদী বলেন হজ্জ পঞ্চম হিজরীতে ফরয করা হয়েছে। ইবনে রাফয়াহ ও রাফেয়ীর মতে হজ্জ ষষ্ট হিজরীতে ফরয করা হয়েছে। কিন্তু ইশলাম হারামাইন (র) বলেছেন হজ্জ নবম হিজরীতে ফরয করা হয়েছে। আর এটিই গ্রহন যোগ্য কেননা ক্বোরয়ান শরীফে হজ্জ সম্পর্কে আয়াতঃ-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا যে সকল লোক ক্বাবা শরীফ যেতে সক্ষম তাদের উপর বাইতুল্লার হজ্জ ফরয করা হল।

এ আয়তনটি নবম হিজরীতে নাযিল হয়।

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত

১। মক্কা শরীফ যাওয়া ও সেখান থেকে ফিরে আসার আনুসাঙ্গিক খরচ এর সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকা।

২। হজ্জ সফর কালিন সময়ে তার পরিবারের প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের ব্যবস্থা থাকা।

৩। হজ্জ যাওয়া ও আসার পথে কোন রূপ প্রান হানীর আশংকা না থাকা।

৪। যাতায়াতের কোনরূপ রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতা না থাকা।

৫। জ্ঞানী, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন ও সুস্থ থাকা।

৬। মহিলাদের জন্য এ শর্তগুলোর সাথে স্বামী বা মাহরম লোক থাকা।

হজ্জের প্রকার ভেদ

হজ্জ তিন প্রকারঃ-

১। হজ্জ ইফ রাদঃ- হজ্জের সফরে শুধু মাত্র হজ্জের নিয়েত। ওমরা না করা।

২। হজ্জে তামাত্তোঃ- প্রথমে ওমরার নিয়েত করে এহরাম বেঁধে মক্কায় গিয়ে ওমরার কাজ সেরে এহরাম খুলে ফেলে পরে নতুন ভাবে এহরাম বেঁধে হজ্জ আদায় করা। হাজীগন এটাই বেশি করেন।

৩। হজ্জে কেরানঃ- একই সাথে হজ্জ ও ওমরার এহরাম বেধে এটা খুবই কষ্ট কর-

হুজুর কিবলা বলেন রসুলেপাক (সাঃ) যে ভাবে হজ্জের নিয়মগুলি পালন করেছেন ঠিক সেই ভাবে হজ্জ পালন করা উচিত। তিনি আরও বলেন হজ্জ কারীদের সব সময়ে মনে করা দরকার যাতে তাদের হজ্জ কবুল হয়। এবং সে জন্য হজ্জের আহকামগুলি যেন ঠিকমত পালন হয়, এবং আন্তরিকতার সাথে হজ্জ কবুলের জন্য দোওয়া চাইতে হয়। কবুল হওয়া হজ্জকারী জীবনে

কোন দিন কোন প্রকার অন্যায় অবিচার পাপ এবং কারো ক্ষতি করতে পারেন না। তিনি সম্পূর্ণ মাসুম শিশুর মত হয়ে যান। এবং মানুষের উপকার সাধনে এবং এবাদত বন্দেগীতে দিন কাটান।

হজ্জের উদ্দেশ্য

হজরত আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন হজরত রাশুল করিম (সাঃ) ইরসাদ করেছেন। তোমরা পর পর একত্রে হজ্জ ও ওমরাহ পালন কর। কেননা হজ্জ ও ওমরাহ দরিদ্রতা ও গুনাহ কে দুর্বল করে দেয়। যেমন হাপরের আগুনে লোহা, সোনা, ও রুপার ময়লা দূর হয়। একটি কবুল হজ্জের প্রতিদান বেহেস্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

হজরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) বলেছেন রশুল পাক ইরশাদ করেছেন। যদি কেহ হজ্জ করে এবং তাতে কোন রূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরন না করে তবে তার পূর্বর্তি গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (৭৫৮ তিরমিজী শরীফ) ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াইয়া (রহঃ) বর্ণনা করেছেন হুজূর পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন একটি ওমরাহ পরবর্ত্তী ওমরাহ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের পাপ সমূহের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। নিখুঁত অর্থাৎ মকবুল হজ্জের বদলা বেহেস্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। (১২৮৪) মুসলিম শরীফ।

হজ্জের ফরজ

হজ্জের ফরয তিনটি (১) এহরাম বাঁধা (২) জিল হজ্জ মাসের নয় তারিখে আরাফতের ময়দান অবস্থান করা। (৩) এবং বায়তুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করা।

হজ্জের শুন্নাত

(১) ইমামের পিছনে আরাফাতের ময়দানে গমন করা। (২) তাওয়াফে কুদুম করা। (৩) সাফা মারওয়াতে সাত বার দৌড়ান। (৪) শয়তানের প্রতি নির্দিষ্ট সংখ্যক কাঁকর মারা।

ইহরাম

ইহরাম বাঁধার পূর্বে খুব ভালো করে ক্ষৌর কর্ম করে নিতে হবে। তারপর গোশল ও ওদ্বু করে সেলাই বিহীন ৫ হাত লম্বা দুখন্ড সাদা এবং পবিত্র কাপড়ের এক খন্ড লুঙ্গির মত করে পরবে। আর এক খন্ড চাদরের মত করে গায়ে জড়াবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা নিজের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ইহরাম পরিধান করবে।

মেয়েরা সেলাই যুক্ত সাদা বা রঙ্গিন কাপড় পরিধান করবে। যদি মাকরূহ ওয়াক্ত বা জাওয়াল ওয়াক্ত না হয় তবে দু রাকাত নফল নামাজ আদায় করে এহরাম বাঁধবে, ও এই দেওয়া পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ الْحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّیْ আল্লাহুম্মা ইন্নি উরীদোল হজ্জে (আই আল্লাহ্ পাক আমি হজ্জ করার ইচ্ছা করছি) ফাইয়াশশের হুলি (অত এব ইহাকে সহজ করে দিন আমার জন্য) ওয়া তাক্বাবাললু মিননী (এবং আমার থেকে কবুল কর)।

এর পর তালাবিয়াহঃ-

لَبَّیْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ ـ لَبَّیْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ

লাব্বাইক (তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি) আল্লাহুম্মা লব্বাইক (আয় আমি উপস্থিত) লা শ্বারীকালাকা (তোমার কোন শরীক বা অংশিদার নেই) লাব্বাইক (আমি উপস্থিত) ইন্নাল হামদা (নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা) ওয়ান নেয় মাতালাকা (এবং সকল নেয়াত তোমারই) ওয়াল মুলকো (এবং রাজত্ব)। লা শ্বারীকা লাকা (তোমার কোন অংশিদার নেই)।

এই তালাবিয়া পুরুষ উচ্চসবে এবং মহিলা নিম্নস্বরে পড়বে। খুব বেশী করে তালাবিয়াহ পাঠ করবেন। - বার বার পাঠ করবেন হিজরে আস ওয়াদ পৌছান পর্যন্ত সব সময়। এবং মানে গুলি উপলব্ধি করতে হবে এবং ভাবতে হবে আমি পৃথিবীর সবোর্ত্তম ও সর্বো পবিত্র জায়গায় হাজির হতে চলেছি যেখানে আদম আলাইহে সালাম থেকে সমস্ত নবী রসুলগনের কদম মুবারক পড়েছে। পাছে কোনরূপ বে আদবী না হয়, সে ব্যাপারে খবই সতর্ক থাকতে হবে।

মশজিদে হারামের প্রবেশ করার নীতিঃ-

কাবা পৌঁছে খুবই বিনয়ের সাথে তালাবিয়াহ অর্থাৎ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লা শারিকা লাকা) পাঠ করতে করতে সালাম দিয়ে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। এবং কাবা শরীফ দেখামাত্র এই দোয়াটি لَا شَرِيْكَ لَكَ (আল্লাহো আকবার লা এলাহা ইল্লল্লাহো আল্লাহো আকবার পড়তে হবে মানেটি মনের মধ্যে উপলব্ধি করতে হবে।

ত্বাওয়াফ

নবীপাক (সাঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত নিয়মে মহান আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিন করার নাম তাওয়াফ। পবিত্র কাবা ঘরের হাজরে আসওয়াদ আছে। সেই জাগায় বরাবর দাঁড়ালে হাতের ডান দিকে একটি সবুজ বাতি ছোখে পড়বে। ঐখানে হাজরে আসওয়াদে চুমা দিয়ে কাবা ঘর বাম দিকে রেখে কাওয়াফ শুরু করতে হয়। যদি চুমু দেওয়া সম্ভব না হয় তবে ডান দিকে ঐ সবুজ বাতির সোজা দাঁড়িয়ে হাজ্জরে আসওয়াদ-এর দিকে মুখ করে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে তাওয়াফ শুরু করতে হয় বা সামনে আগাতে হয়। এভাবে ঘুরে আবার সবুজ বাতি পর্যন্ত পৌঁছলে এক চক্কর পূর্ণ হয়। এক এক করে সাত চক্কর পূর্ণ হলে একবার ত্বাওয়াফ করা হয়। সেখানে তাওয়াফ করা হয় তাকে মাতাফ বলে।

ওমরাহ কি ভাবে আদা করতে হয়-

সমস্ত হজ্জের মধ্যে তামাত্তো হজ্জ সবথেকে সহজ। বেশিরভাগ হাজী এই হজ্জ পালন করেন।

তামাত্তো হজ্জ আদা করার জন্য প্রথমে ওমরাহ আদা করতে হয়। সর্বপ্রথম নিজের দেশের এয়ার পোর্ট বা বিমান বন্দর থেকে ওমরাহ -এর নিয়েত করে এহরাম পরে নিতে হবে। এরপর বরাবর তালাবিহা-যথা 'আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নাল হামদা ওয়া নেয়মাতা লাকা ওয়ালা মুলকা লা-'শারীকালাকা' বরাবর পড়তে হবে। এবং নিজের থাকার জায়গা বা বাসা ঠিক করে ক্বাবা শরীফের দিকে রওয়ানা হতে হবে। ক্বাবা শরীফ নজরে আসামাত্রই দোওয়া চাইতে হবে। এই সময় চোখের পলক না ফেলে যে দোওয়া হবে, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাহা কবুল করবেন।

হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এসে তালাবিয়াহ পড়া বন্ধ করে দিতে হবে। এখন তাওয়াফের নিয়তে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে এ দোওয়া পাঠ করতে হবে।-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالسَّلَاوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ ه

বিসমিল্লাহে আল্লাহো আকবার। আল্লাহর নামের সাথে আরম্ভ করছি। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়) লা এলাহা ইল্লল্লাহু (তিনি ছাড়া কেহ উপাস্যের যোগ্য নহে) ওয়া লিল্লাহিল হামদ (এবং তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা)। ওয়াসসালাওয়াতো ওয়াসসালাম (এবং দরুদ ও শান্তি/সালাম) য়ালা রসুলিল্লাহে (রোসুল (সাঃ) এর উপর) আল্লাহুম্মা (হে আল্লাহ) ঈমানান বেকা (আপনার উপর ইমান/বিশ্বাস রাখি) ওয়া তাসদীক্কান বে কেতাবেকা এবং (আপনার কিতাব কে সত্য জানি)
ওয়া ওয়াফায়ান বে য়াহদেকা (এবং আপনার অঙ্গিকার পূরা করার লক্ষ্যে) ওয়াত্তাবায়ান শুন্নাতে নাবীয়াকা (এবং আপনার নবী মোহাম্মাদ সল্লল্লাহো অলায়হি ওয়াসাল্লামের শুন্নাতের অনুসরনে) মোহম্মাদিন সল্লল্লাহো এয়াইহে ওয়া সাল্লামা। মুহম্মদ (সাঃ) উপর **উচ্চারণ ও অর্থঃ**-

আল্লাহুম্মা (আয় আল্লাহ্) ইন্নি উরীদো (নিশ্চয়ই আমি ইরাদা করছি) ত্বাওয়াফা বাইতেকাআল হারামা (তোমার পবিত্র ঘর তাওয়াফ করার) ফাঈয়াশ্ব শ্বেরহুলি (অতএব তাহা আমার জন্য সহজ করে দিন) তব্বাকবালহু মিনান্ (আমার হইতে তাহা কবুল কর) শাবয়াতা আশওয়াত্বিন (সাত চক্কর) লিল্লাহে (আল্লাহ্ তায়ালার জন্য) ওয়া য়াযমা ওয়া জাল্লা (এবং শক্তি বৃদ্ধি কর)।

এই নিয়ত করেই হাত দুটো কাঁধ পর্যন্ত তুলতে হবে। সম্ভব হলে পবিত্র হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে হবে। না হলে দূর থেকেই ওই দিকে ইশারা করে বলতে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ. اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَتِبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ

উচ্চারণ ও অর্থঃ-

বিশমিল্লাহে আল্লাহু আকবার (আল্লাহর নামের সাথে শুরু করছি আল্লাহ্ মহান) আল্লাহুম্মা (আয় আল্লাহ্) ঈমানান বেকা (তোমার উপর ঈমান এনেছি) ওয়া তাস্বদীক্কান বে কেতাবেকা (এবং তোমার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রেখেছি) ওয়া ওয়াফায়ান বে য়াহ্দেকা (এবং পূর্ণ করে দাও তোমার প্রতিশ্রুতি) ওয়াততেবায়ান লে শুন্নতে নাবীয়েকা (তোমার নবী করীম (সঃ) শুন্নতে অনুসরনে। অথবা **بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ. وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ** বলে তাওয়াফ শুরু করবে।

উচ্চারণ ও অর্থঃ-

বিশ্মিল্লাহে আল্লাহু আকবার (আল্লাহর নামের সহিত শুরু করছি আল্লাহ্ মহান) ওয়া লিল্লাহিল হামদ (এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য) যদি সায়ী করার ইচ্ছা থাকে। তবে তিনচক্করে রমল অর্থাৎ বীরত্বের সাথে হাঁটা আর ইযাতিবা অর্থাৎ চাদর ডান বগলের নিচে থেকে বের করে বাঁ কাঁধে রাখবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

তাওয়াফ-এর দোওয়া

অনেক কিতাবে তাওয়াফের বড় বড় দোওয়ার উল্লেখ আছে। কিন্তু ক্বোরআন ও হাদীশে ও এসব দোওয়ার কোন উল্লেখ নেই এমনকি নবিপাক (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আজমাঈন-ও এসব দোওয়া পাঠ করেন নি। তাওয়াফের নিয়ত করে পবিত্র হজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে বা চুমু দিয়ে এই দোওয়া পাঠ করেই তাওয়াফের সূচনা করতে হয়। এবং দোওয়ার অর্থ বুঝে অতি বিনয়ের সাথে দোওয়া পড়তে হয়। দোওয়া-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

উচ্চারণ ও অর্থঃ-

সুবহানাল্লাহে (মহান আল্লাহ্ পবিত্র) ওয়াল হামদো লিল্লাহে (এবং যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য) ওয়ালা এলাহা (এবং তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই) ইল্লল্লাহ (কিন্তু আল্লাহ্ আছেন) ওয়াল্লাহো আকবর (আল্লাহ মহান) ওয়ালা হাওলা (এবং নাই কোন আশ্রয়) ওয়ালা কুওয়াতা (এবং নাই কোন শক্তি) ইল্লা বিল্লাহিল (আল্লাহ্ ছাড়া) আলিইল আজ্বীম (সর্বশক্তিমান ও মর্যাদাপূর্ণ) ওয়াস সালাতো ওয়া সালামো আলা রাসূলিল্ লাহে (আল্লাহর রশুরের উপর) স্বাল্লাল লাহো আলাহে ওয়াসাল্লাম (তাহার উপর দরুদ ও সালাম) এই দাওয়াটি প্রতি চক্করের পাঠ করতে হবে। যদি আর দোওয়া না মনে থাকে তবে শুদ্ধ এই দোওয়াটি পড়লেই চলবে। তাই এই দোওয়াটি মনে রাখা একান্ত দরকার।

এই রূপে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছলে এক চক্কর হবে। এমন ভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করে হাজরে আসওয়াদকে চুমা দিতে হবে। তাহলেই তওয়াফ পূর্ণ হবে। এর পর মাকামে ইবরাহীমের দিকে আগিয়ে যাবেন যার সম্বন্ধে এই আয়াত **وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى**(ওয়াত্তাখেযু) এবং তৈরী করা বা বানাও। (মিম মাক্কামে ইব্রাহীমা (মোক্কামে ইবরাহীমকে)। (মুস্বাললা) নামাজের জায়গা, নাযিল হয়েছিল॥ মাক্কামে ইব্রাহীমের পিছনে দাঁড়িয়ে দু রাকাত নামাজ আদায় করবে। এই দুই রাকাত নামাজ তয়াফের জন্য ওয়াজীব। নামাজ শেষে মুলতাযিমে অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ ও দরজার মধ্যবর্তী জায়গায় এসে দোওয়া চাইবে। এরপর যমযম কূপের কাছে এসে তিন দমে বা তিন স্বাসে যমযমের পানি পেটপুরে পান করে এই দোওয়া যথা- **اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّاِسِعًا وَّعَمَلًا صَالِحًا وَّشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ** আল্লাহুম্মা ইন্নিআশ্য়ালুকা (হে আল্লাহ্ আমি আপনার কাছে কামনা করছি) ইলমান নাফেয়ান (উপকারী বিদ্যা) ওয়া রেযক্বান ওয়াশেয়ান ওয়া য়ামালান স্বালেহান (পর্যাপ্ত সুন্দর জীবন যাপনের ভাল আমল) ওয়াস্বেকায়ান (এবং রোগ

মুক্তি) মিন কুল্লে দাহন্ (সকল প্রকার রোগ হতে) এরপর সায়ী করার ইচ্ছা থাকলে পুনরায় হাজরে আসওয়াদকে চুমা দিয়ে স্বাফা পাহড়ের দিকে যাবেন যেন কাবা ঘর দেখা যায়া। এবং এই আয়াতটি পড়বেন।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ه

ইন্নাস্ সাফা ওয়াল্ মার্ওয়াতা (নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া) মিন শায়া য়ে রেল্ লাহে (আল্লাহর নিদর্শন সমূহ হতে) ফামান্ হাজ্জাল্ বাঈতা আও এতামারা (সুতরাং যে ব্যক্তি কাবা শরীফের হজ্জ বা উমরা করে) ফালা জোনহা য়ালাঈহে (তার জন্য দোষনীয় নয়) আঁঈ ঈয়াত্বত্বাও ওয়াফা (তাওয়াফ করিতে) বে হিমা (তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ ঐ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে) ওয়ামান তাত্বাওওয়ায়া খাইরান (যে ব্যক্তি ভাল কাজ করল) ফা ইন্নাল্লাহা (অতঃপর নিশ্চয়ই আল্লাহ) স্বাকে রুন্য়ালীন (বিনিময় দানকারী ও সর্বজ্ঞ)। হজরে আসওয়াদ বা সবুজ বাতির কাছাকাছি হলেই প্রতি চক্করের শেষে এই দোওয়াটি পাঠ করবেন বা মোনাজাত করবেন।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا مَعَ الْاَبْرَارِ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ه

উচ্চারণ ও অর্থঃ-

রাব্বানা (হে আমাদের প্রতিপালন প্রভু) আতে না (আমাদিগকে দাও) ফিদ্দুনঈয়া (দুনিয়াতে বা পৃথিবীতে) হাশানাতাঁও (কল্যান বা মঙ্গল) ওয়াফিল্ আখেরাতে (এবং আখেরাতের বা পরকালের) হাসানাতাঁও (মঙ্গল বা কল্যান) ওয়া ক্বেনা (এবং মুক্তি দাও) আয্বাবান-নার(জাহান্নামের আগুন থেকে বা জাহান্নামের শাস্তি থেকে) ওয়াদখেল্ না (এবং আমাদের প্রবেশ করাও) মায়াল আবরার (সৎ লোকেদের সাথে) ঈয়া য়াযীযো (হে বন্ধু) ইয়া গাফ্ফারো (হে ক্ষমাকারী) হে য়াযীযো (হে বন্ধু) ঈয়া গাফ্ফারো (হে ক্ষমাকারী) ঈয়া রাববেল আলামীন (হে সমস্ত জগতের শ্রেষ্টা প্রতিপালক)।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ طَوَفَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فَيَسِّرْهُ لِىْ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَعَزَّوَجَلَّ

এরপর এখানে কিবলামুখী হয়ে তিনবার কালিমা তৈয়েব লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাশুলুল্লাহ্ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ও তিনবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ তাকবীর ও তিনবার শুরা ফাতিহা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পাঠ করবে। এরপর উভয় হাত তুলে মুনাজাত করবেন, কেননা এটিও দোওয়া কবুলের জায়গা। এর পরে সাফা হতে মারওয়ার দিকে অগ্রসর হবেন ও মনে যেসকল দোওয়া আসে তা পড়তে থাকবেন। মারওয়াই গিয়ে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দোওয়া করলে তবেই এক চক্কর পূর্ণ হবে। এই ভাবে মারওয়া হতে পুনরায় সাফায় গিয়ে পৌঁছালে দু চক্কর হবে। এমন করে সাত চক্কর পূর্ণ হবে। সপ্তম চক্কর মারওয়াতে এসে শেষ হবে। এর পর দোওয়া চাইবেন।

এরপর মাথার চুল কাটতে হবে, ও এহরাম খুলে দিবেন। ওমরাহ পূর্ণ হোল।

তামাত্তু হজ্জঃ-

৮ই জিলহজ পুনরায় এহরাম পরে তামাত্তু হজ্জের নিয়ত করে কাবা শরীফ তাওয়াফ করবেন। সকালে এমনসময়ে মিনার দিকে রওয়ানা হবেন, যেমন সেখানে গিয়ে জোহারের নামাজ আদায় করা যায়। ঐ দিন জোহর, থেকে পরদিন আস্বর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান ও রাত্রি যাপন করতে হবে। মিনায় মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হবে। মিনার দিকে রওয়ানা হওয়া থেকে মিনায় থাকার সময় তালাবিহাহ অর্থাৎ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ পাঠ করতে হবে।

৯ই জিলহজ্জ ভোরে আরাফার দিকে রওয়ানা হবেন এবং সবসময় তকবীর ও তালাবিয়াহ পাঠ করবেন। আরাফায় এসে খাবার দাবার শেষ করে সূর্য ঢলার আগেই গোসলের কাজ সমাধা করে নিবেন। গোসল সেরে মসজিদে গিয়ে ইমামের খুৎবা শুনবেন ও ঐখানে জোহর ও আস্বর এক সাথে আদায় করবেন। এই নামাজ গুলির জন্য আজান ও ইকামত একবারই আদায় করতে হবে। উভয় নামাজের মাঝে শুননাত ও নফল কিছু পড়তে হবে না। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর আরাফাত থেকে মুজদলফা যেতে হবে। মুজদলফা পৌঁছিয়ে মগরিব ও ঈশার নামাজ এক সাথে আদায় করতে হবে। ঐই খানে কোন ময়দানে রাত্রি যাপন করতে হবে। মুজদালিফা হতে যাওয়ার সময় প্রথমে রমিয়ে জেমার এর জন্য ছোট ছোট কাঁকর কুড়িয়ে নিতে হবে পথ থেকে

নিলেও চলবে। তবে জামরার হোতে নেওয়া যাবে না।

১০ই জিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পরই দেরী না করে ফজরের নামাজ আদায় করে নিবেন। সূর্য ওঠার আগেই মুজদলফা থেকে মিনায় যেতে হবে। পথে ওয়াদিয়ে মুহাসসার জায়গাটি খুব তাড়াতাড়ি পারহোতে হবে। কারন এখানেই আসহাবে ফি'লের উপর আল্লাহ্ তায়ালার গজব এসেছিল।

মিনায় গিয়ে পর পর তিনটি শয়তান কে ৭ টি করে কাঁকর ছুঁড়তে হবে। প্রতিটি কাঁকর মারার সময় দোওয়াটি পড়বেন।.....বিশমিল্লাহে (আল্লাহর নামের সাথে) আল্লাহ্ আকবার (আল্লাহ্ মহান) রাযমান লিশ্বশ্বাঈত্বনে (শয়তানের উপর কাঁকর মারছি।) রিদ্দন বির রহমান। (জেন আলালহ আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।)

প্রথম কাঁকর মারা আগেই তালাবিয়াহ বন্ধ করে দিতে হবে। কাঁকার মারার পর দেরী না করে নিজ নিজ জায়গায় চলে যেতে হবে। কোরবানী করতে হলে ইফরাদি হাজীর জন্য এ কোরবানী ওয়াজীব নয় কিন্তু মোস্তাহাব। কোরবানীর পর মাথা মুন্ডন করতে হবে ও এহরাম খুলে দিতে হবে। এরপর তওয়াফে যিয়ারত করবেন। সাধারণ কাপড়ে। আর ইহা ১০ই জিলহজ্জ থেকে ১২ ই জিলহজ্জ পর্যন্ত করা যায়। তবে ১০ জিলহজ্জ তারিখেই সবচেয়ে ভাল তাওয়াফে যিয়ারত কারর পর দু রাকাত নামাজ আদায় করতে হবে। এরপর সাফা মারওয়াতে সাহি করতে হবে।

১১ই জিলহজ্জ সূর্য ঢলে যাবার পর ছোট, মধ্যম ও বড় শয়তান তিনটিতেই সাতটা করে কাঁকর মারতে হবে এবং উপরক্ত দোআ পাঠ করতে হবে। মশজীদে খাইফ হতে মক্কার দিকে প্রথমটি হোল ছোট তার পর মধ্যম ও তারপর বড়। এখানে ধারাবাহিক ভাবে কাঁকর নিক্ষেপ করা শুন্নাত। প্রথম ও দ্বিতীয় টিতে কাঁকর মারার পর একটু সরে গিয়ে কালেমা, দোওয়া তাকবীর ও ইস্তেগফারে কিছু সময় মগ্ন থাকতে হবে। এবং তৃতীয়টিতে কাঁকর মারা পর নিজের জায়গায় চলে যাবেন। মনে রাখবেন শয়তানকে কাঁকর মারলেন? না নিজের মনের শয়তানকেই কাঁকর মারলেন? এবং কাঁকর মারার পর থেকে আর কোনরূপ শয়তানের ধোঁকায় পড়বেন না।

১২ই জিলহজ্জ ও সূর্য ঢলার পর ঐ একই ভাবে শয়তানকে কাঁকর মারতে হবে। এই দিন সূর্য্য ডুবার আগে মক্কা শরিফে তাওয়াফে বিদার জন্য ফিরে আসতে হবে।

বিদায়ী তাওয়াফে

মিকাতের বহিরাগতের জন্য এ তাওয়াফটি করা ওয়াজেব এবং তাওয়াফ শেষে দুরাকাত নামাজ আদায় করে যমযমের পানি পান করতে হবে। পরে মুলতাযেমের কাছে কাবা ঘরের গিলাফ ধরে মন ভরে দোওয়া করবেন ও ইস্তেগ্ফার পড়বেন। আর কান্নাকাটি করে খুবই দুঃখের সাথে কাবা ঘরকে বিদায় জানাবেন।

কাবা শরীফ জিয়ারত

আল্লাহ পাক ৮ম হিজরী থেকে পবিত্র হজ্জ পালন করার জন্য সেই সব বান্দাদের জন্য ফরয করেছেন যারা হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ভ্রমন করতে সক্ষম। যারা তাদের জন্য যা খরচ যাওয়া আসা এবং থাকা ও বাড়িতে পরিজনের ঐ সময়ের জন্য সংসারের খরচ বাবদ সবই যথেষ্ট হবে। তাই মহান আল্লাহ্ পাক পবিত্র ক্বোরআন শরীফের শুরা ইমরানের ৯৭ আয়াতে বলেছেন.....(আল্লাহর উদ্দেশ্য এই গৃহের হজ্জ করা সেই সকল মানুষের কর্তব্য-যাহারা ঐ পথাতিক্রমে যথেষ্ট সমর্থ) হজ্জ আদায় করার পূর্ণ সামর্থ থাকায় যারা হজ্জ পালন করে না তাদের সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) বলেন। কোন ব্যক্তির ঐ পরিমান অর্থ বা সম্পদ আছে যা দিয়ে সে কাবা শরীফ জিয়ারত সহজভাবে করতে পারে। কিন্তু যদি না করে, তার মৃত্যু এমন হবে যা ইহুদি খৃষ্ঠান বা বেদীন এর মত। তিনি আরও বলেছেন বিশুদ্ধ বা মকবুল হজ্জ পৃথিবী এবং পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম। জান্নাত ব্যতীত আর কোন কিছুই এর বিনিময়ে হতে পারে না। (বোখারী মুসলিম)

মদীনা শরীফ জিয়ারতঃ-

হজ্জের তাওয়াফে ওয়েদার পর অর্থাৎ হজ্জ সম্পন্ন হওয়ার পর মদীনা মনোওয়ারা গিয়ে নবীকরিম (সাঃ) এর জিয়ারত করা একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে অনেক সওয়াব ও বরকত আছে। এই জিয়ারত প্রত্যেক মুশলমানের জন্য এক আকাঙ্খার বস্তু যারা সৌভাগ্যবান হয়, তাদেরই এই জিয়ারত নসিব হয়। হাদীশ শরীফে আছে-রশুলপাক (সাঃ) বলেছেন বা নির্দেশ দিয়েছেনঃ- হজের পর যে ব্যক্তি আমার রওজা জিয়ারত করল। সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। (তাবরানী) আবার বায়হাক্কীতে আছে যে ব্যক্তি হজ্জের পর আমার রওজা জিয়ারত করল, তারজন্য আমার সাফাওয়াৎ ওয়াজেব থাকল।

হজ্জের পর মক্কা থেকে মদীনা যাবার সময় বেশী বেশী দরূদশরীফ পড়া উচিৎ। এছাড়া মদীনা শরীফে যতদিন থাকবেন, প্রত্যেক দিন বেশী বেশী করে দরূদশরীফ পাঠ করবেন। এখানে এত সময় থাকা উচিৎ যেন (৪০) চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারনে। তবে বেশী সময়ও থাকতে পারেন। নামাজ ও দরূদ বেশী বেশী পাঠ করবেন। তাহাজ্জুদ জামাতে আদায় করবেন।

মসজীদে নওয়ারী এবং রওজা মোবারক-এ প্রবেশের সময় যাতে বেয়াদবী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। পাক্ শরীর, পাক্ কাপড় ও ওদ্বুতে (উজুতে) থাকা আবশ্যকীয়। মশজীদ শরীফের দুয়ারে উঠে সর্বপ্রথম বলবেন,..... (বিসমিল্লাহ্) বিসমিল্লাহে ওয়াস্বস্বালাতো ওয়াশ্ সালামো য়ালা রাসুলুল্লাহ্। ডান পা প্রথমে ও পরে বাম পা রাখবেন। ভীতরে প্রবেশ করে রওজা শরীফের পাশে রীয়াজুল জান্নাহ নামে একটি জায়গা আছে-এটা একটি জান্নাতেরই টুকরো স্বরূপ। ইহা মিমবার শরীফের মাঝা মাঝি জায়গা। এই খানে দুই রাকাত নফল নামাজ তাহঈয়াতুল মস্জীদ নামাজ পড়তে হবে- এই নামাজে অনেক শওয়াব পাওয়া যায়।

রওজা মোবারক জিয়ারতে গিয়ে প্রথমে আদবের সাথে সালাম ও দরূদ পেশ করবেন। তারপর যা কিছু পড়ার যা আপনার খেয়ালে আসবে পড়ে উনার নাম মোবারক-এ সওয়াব পেশ করবেন ও রওজা শরীফের দিকে মুখ তুলে দুহাত তুলে উনার অর্থাৎ নবী পাক (সাঃ) এর ওয়াশিলায় দোওয়া চাইবেন।

খুবই আদবের সাথে রাসুলে পাক (সাঃ)-এর মাজার শরীফের কদম মোবারকের দিক দিয়ে মাজার শরীফে প্রবেশ করতে হবে। খেয়াল রাখবেন যেন পিঠ না হয়। পরম শ্রদ্ধার সাথে, যাতে বেয়াদবী না হয় সে দিকে খেয়াল রাখবেন। নামাজ পড়ার সময়ও যেন পিঠ না হয়, রওজা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে তহরীমার মত হাত বেঁধে অতি নম্রতার সাথে এই আকিদা অর্থাৎ বিশ্বাস নিয়ে ভাবতে হবে আমি যা কিছু আরজ করছি উনি নবী পাক (সাঃ) সবই শুনছেন।

এরপর বলুন-আশালামো আলাঈকা ঈয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আস্সলামো আলাঈকা ইয়া শাফীয়েল মুযনোবীন আসসালামো আলাঈকা ঈয়া খাতেমুন নবীঈনা ওয়া য়ালা আলেহি ওয়া আসসালামো আলাঈকা ইয়া আঈয়োহান নাবীয়ো ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ ওয়া বারকাতোহু।

মাজার শরীপে সালাম পৌঁছানোর পর যে যে শুরাহ মনে আছে তাহা অতি আদবের সাথে এবং মানেগুলি খেয়াল করে কি বলছেন সেই রকম ভাবনা নিয়ে সুরাহ গুলি পাঠ করে ও দরূদ শরীফ পাঠ করে নবী পাক (সাঃ) উপর নজর করে বা শওয়াব পৌঁছে সবার জন্য দোওয়া চাইবেন।

জিয়ারতের পর আবার সালাম পেশ করে হাত আগিয়ে গিয়ে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এর রওজার সামনে দাঁড়িয়ে এই ভাবে সালাম পেশ করুন-১। আশ্শালামো য়ালাঈকা ঈয়া খালীপাতুর রাশুলিল্লাহ্। তারপর ডানদিকে আরও একহাত আগিয়ে হজরত উমার (রাঃ) এর মাজার -এ সালাম পেশ করুন-২। আশ্শালামো য়ালাঈকা ঈয়া আমীরুল মুয়মেনীন। এরপর জান্নাহতে গিয়ে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করুন ওপরে জান্নাতুল বাকিতে যাবেন। গেটে পৌঁছে পড়ুন-৩। আশ্শালো য়ালাঈকা ঈয়া

আহলিল বাক্কীয়ে। এরপর হজরত ফাতেমাতুজ্জাহারা (রাঃ) মাজার শরীফে হজরত এমাম হাসান (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম গনের মাজার শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করে তেলাওয়াৎ ও দরূদ শরীফ পড়ে শওয়াব পৌঁছে দোওয়া দ্বিগুন।

বাইয়াত গ্রহন করার প্রয়োজনীয়তা

মুরীদ হওয়ার আবশ্যকীয়তা।

বাইয়াত.....শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ ক্রয়-বিক্রয় শর্ত করা। কেননা 'বায়' শব্দ থেকে বাইয়াত শব্দটি এসেছে। বাইউন শব্দের অর্থ যেমন বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি থাকে, আনুরূপ প্রতিশ্রুতবদ্ধ বিষয়কেই বাইয়াত বলে। ইসলামের পারিভাশিক অর্থে মুসলমানগণ জাগতিক ধন-সম্পদ, মান-ইযযত, এমনকি প্রয়োজেনবোধে নিজেদেরকে জীবনের বিনিয়ে হলেও ইসলাম রক্ষার্থে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া তথা শপথ গ্রহণ করাকেও বাইয়াত বলে।

এসব বিভিন্ন অর্থেই সাহাবাগন রাশূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বাইয়াত গ্রহন করতেন। কিন্তু বর্তমানে পীর-মুরীদের ক্ষেত্রেই শুধু বাইয়াত গ্রহণের প্রকৃত অর্থ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যেহেতু কামেল পীরের বা মুর্শিদের নিকট বাইয়াত গ্রহন না করা পর্যন্ত মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন থেকে যায় অপরিপূর্ণ। অথচ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই ইসলামের সকল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কামেল পীর ব্যতীত আত্মিক হওয়া সম্ভব নয়। মানবদেহ বস্তুজগতের অর্ন্তভুক্ত। আর মানবাত্মা অবস্থান বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে, ইন্দ্রীয়াজ্ঞানের বাইরে আত্মার অবস্থান ছিল আলমে আমরের অন্তর্গত। কিন্তু এই নিষ্কলুষ ও নিস্পাপ আত্মা বস্তুজগতের আবিলতায় বদ্ধ হয়ে পড়ায় নিত্য সে কলুষিত হয়ে পড়েছে এবং সে তার আদি সত্তার গুণাগুণ হারিয়ে ফেলেছে। আদিবাস ও স্বজাত-স্বজনহারা হয়ে পড়ায় সে সদা বিরহব্যথায় বিরহবিলাপ করেই চলেছে।

এই অর্থে মাওলানা রুমী তাঁর মাসৃনবীতে বলেনঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সঙ্গ লাভ করতে ইচ্ছুক, তাকে বল, সে যেন আল্লাহর ওলীর সঙ্গ লাভ করে। কিছু সময়ের জন্য হলেও আল্লাহর ওলীর সঙ্গ লাভ করা শত বছরের লৌকিকতাহীন আরাধনা ও উপাসনার চেয়েও উত্তম।

এ জন্যই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী আত্মাকে আল্লাহর রঙে রঞ্জিত করে তোলার, নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়ে থাকেন কামেল পীরমুর্শিদগণ। বস্তুজগৎ থেকে অতীন্দ্রীয় আত্মিক জগতের সাথে মুরীদের আত্মাকে সংযোগ স্থাপন করে দেয়াই পীরের দায়িত্ব। ঐ আত্মিক জগতের উন্নত পথে চলার যেসব শর্তসমূহ রয়েছে তা মেনে চলার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া মুরীদের কর্তব্য। পীর ও মুরীদের মধ্যে এইরূপ অঙ্গিকার আবদ্ধ সোপানে উন্নীত হওয়া ভক্তের পক্ষে একাকী সম্ভব নয়। শিষ্যের পক্ষে আত্মনিষ্ঠ সিদ্ধ পুরুষের সাহচার্য লাভ করা অপরিহার্য।

বাইয়াত গ্রহন করার স্বপক্ষে প্রমাণাদিঃ-

১। হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রাঃ) রচিত কাউলুল জামীল নামক গ্রন্থে মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর যুগে তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহন করা যদিও বহু অর্থে ও বিষয়ে প্রযোজ্য ছিল, তথাপি বর্তমানকালে তা কেবল একই অর্থে ও একই উদ্দেশ্য প্রয়োগ হয়ে আসছে। তবু তা মৌল উদ্দেশ্যের কোনরূপ বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনের ভাষায় বলেনঃ

১। ওহে মুহাম্মাদ (সাঃ), যারা আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহন করেছে, তারা মূলত আল্লাহর নিকটই বাইয়াত (শপথ) গ্রহন করেছে। আল্লাহর (অপ্রতিরুদ্ধ) হাত তাদের হাতের উপরই রয়েছে। তারপরও যে ব্যক্তি তার এই বাইয়াত বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, বাস্তবে সে তার নিজেরই ক্ষতি সাধন করেছে। অনন্তর যে ব্যক্তি আল্লাহরর সঙ্গে কৃত ওয়াদা রক্ষা করে চলে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে অতিসত্বর পুরস্কৃত করবেন।

২। বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে যে, লোকজন বিভিন্ন বিষয়ে রাশুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট বাইয়াত গ্রহন করতেন। যেমন হিজরত,

জেহাদ, আকরানে ইশলাম, শুন্নাতে রাশুল (সাঃ) প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি। বিভিন্ন বিষয়ের উপর অঙ্গি কারবদ্ধ হওয়াকেই বাইয়াত বলা হয়। অনুরূপভাবে মুরীদ তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ ও তাঁর দিদারের আশায় নিজের মান-সম্মান, ধন-সম্পদ এমন কি প্রয়োজনবোধে জীবন নিয়ে হলেও আল্লাহর পথে সবকিছু উৎসর্গ করে দেয়ার ওয়াদার আবদ্ধ হওয়ার নামই বায়াত বা মুরীদ হওয়া।

৩। মুর্শিদে কামেলের নিকট আত্মসমর্পন করার নামই বাইয়াত অথবা মুরীদ হওয়ার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। এই অর্থেই পীরে কামেলের নিকট বাইয়াত হওয়া শুন্নাত। যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেনঃ

হে ঈমানদারগন তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁরই নৈকট্য লাভের উপায়-উপকরন তালাশ কর। এবং সন্তুষ্টি লাভের পথে সাধনা কর, আশা করা যায় তোমার কৃতকার্য হবে। হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (রাঃ) কাউলাল জামীল নামক গ্রন্থে অত্র আয়াতের টীকায় লিখেছেন যে, উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত ওয়াসীলাতা শব্দের মর্মার্থ হলো, কামেল পীরের তাল্লাশ করা এই পবিত্র আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যায় আরও বলেছেন।

আল্লাহ তায়ালা এই আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা ঐ তরীকত-পন্থীকে নিরাপদ পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন, যে তরীকত-পন্থী আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের পথ অনুসন্ধান করছে।

৪। হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) বলেছেন, পিতা মাতার মাধ্যমে যেমন মানব দেহের উদ্ভব ঘটে, তদ্রুপ মুর্শিদে কামেলের শিক্ষা-দীক্ষায় সে মানবে বিকশিত হয় হাকীকতে ইনশান। সেই মানবই লাভ করে নিঃশব্দ তত্ত্বজ্ঞান। সেই মানবই বুঝতে সক্ষম হন খোদ ও খোদাকে তথা নিজ ও নিরঞ্জনকে বা স্রষ্টাকে।

৫। যার শেখ বা পীর নেই, তার পীর শয়তান। কারন পীর বিহীন ব্যক্তি শয়তানের সূক্ষ্ম চক্রান্ত ও বিভ্রান্তির অতল সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সিদ্ধ পুরুষের দীক্ষাবিহীন শিক্ষা হয় না। এ জন্যই সিদ্ধ পুরুষের দীক্ষা লাভ করা কর্তব্য। কামেল পীর তাঁর মুরীদের অন্তরে একত্ববাদের বীজ বপন করে দিয়ে তাঁর অন্তরাত্মাকে ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত করে তুলেন। কেননা যার অন্তরে আল্লাহার যিকির নেই, তাকে মৃত বলে হাদীশ শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। মেশকাত শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে,
যে ব্যক্তি বাইয়াত বিহীন মৃত্যুবরন করে, তাঁর মৃত্যু অন্ধকারে পরিপূর্ণ।

বাইয়াত গ্রহন করা তথা পীরের আনুগত্য স্বীকার করে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে মহান আল্লাহ বলেনঃ

তোমারা আল্লাহ ও তাঁর রাশুল (সাঃ) এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর এই আয়াতে ব্যবহৃত (উলিল আমর) শব্দ দ্বারা রাষ্ট্রপতি-রাষ্ট্রনায়ক, নেতা বা ইমাম, সংস্কার বা মুজাদ্দেদ, আধ্যাত্মিক গুরু বা পীরমুর্শিদ এ সবকিছুই অর্থই বুঝায়। কারণ রাশুলুল্লাহ (সাঃ) এর আনুগত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে ইশলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের জীবন ব্যবস্থা যার মধ্যে নেই, তার আনুগত্য স্বীকার করে চলার ইংগীত উলিল আম্র ও রাশুল শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। কারন ইশলামের জীবন বিধান বলতে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক তথা শরীয়াত ও তরীকত উভয় ব্যবস্থাকেই বুঝায়। পীর-মুর্শিদের আনুগত্য, স্বীকার করা মানে বাইয়াত গ্রহন করা। কারণ বাইয়াত গ্রহন না করা পর্যন্ত বাহ্যিক শরীয়তসম্মত জীবনব্যবস্থার সম্পূরক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে বাধ্য।

৭। এই অর্থেই ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, মারেফাত ব্যাতীত কেবল শরীয়তপন্থী ব্যাক্তি ফাসেক, আর শরীয়ত ছাড়া কেবল তরীকত-পন্থী ব্যক্তি যিন্দিগ। উভয় বিষয়ে যিনি পরিপক্ক তিনিই কেবল পীরে কামেলের উপযুক্ত।

৮। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেছেন, তরীকত-পন্থী তরীকতের পথে চলতে গিয়ে নানা রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। অনভিজ্ঞ তরীকত-পন্থীর পক্ষে পীরে কামেলের সংশ্রব অপরিহার্য। মুর্শিদে কামেলের নিকট নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলিয়ে দিতে হয়-তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করতে হয়। সংশ্রব

মুর্শিদে কামেলের নিকট আত্মসমর্পণ করে দেওয়া মুরীদের জন্য আবশ্যক। নিজের কামনা-বাসনা এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিমতকে জলাঞ্জলি দিয়ে কামেল পীরের আনুগত্য ও নেতৃত্ব মনেপ্রানে স্বীকার করে নেওয়া ব্যতীরেকে মুরীদের পক্ষে আর কোন পথ নাই। খুশীমনে পীরের আদেশ নিষেধ পালন করতে অঙ্গিকারবদ্ধ হওয়া মুরীদের জন্য অত্যাবশ্যক। কামেল পীরের সাহায্য ব্যতীত একাকী এই দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া মুরীদের সাধ্যাতীত সাধনার ব্যাপার। কারণ ইহা কোন প্রকাশ্য রাজ নয়, বরং এটা পরকালীন সূক্ষ্মতত্ত্ব মূলক বিষয় এবং অদৃশ্য আত্মজগতের অনুসন্ধান ও অন্বেষণ। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবার একটি মাত্র সোজা পথ রয়েছে। অথচ শয়তান এই সোজা পথে অসংখ্য বেড়াজালের সৃষ্টি করে রাখতে সচেষ্ট ও তৎপর। সে উৎসুক্যের দৃষ্টি মেলে ওঁৎ পেতে বসে আছে। সুতরাং অভিজ্ঞ দিশারী বা মুর্শিদে কামেলের সাহচার্য ব্যতীত এই বিপদসঙ্কুল রাস্তা অতিক্রম করা সকলের পক্ষে অসম্ভব। এটা সাধ্যতীত সাধনার পথ।

বাইয়াত গ্রহন করার প্রকৃত অর্থঃ-

এ অজানা-অচেনা পথের দিশারী পীরের পবিত্র হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করার অর্থ হলো যে, পীর তাঁর মুরীদের অন্তরাত্মাকে আল্লাহ পাকের আলো দ্বারা আলোকিত করে তুলেন এবং আল্লাহর নৈকট্য অনুরূপভাবে মুরীদও তাঁর পীরের আরোপিত শর্তাবলি দীক্ষা অনুযায়ী তা মনেপ্রাণে অনুকরণ, অনুশীলন করার অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়া।

বাইয়াত গ্রহন করার উপকারিতাঃ-

বাইয়াত গ্রহন তথা কামেল পীরের সংস্পর্শে সর্বক্ষণ অবস্থান করার ফলে মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়া যায় এবং চরিত্রিক গুণে বিভূষিত হওয়াই তরীকতের প্রধান উদ্দেশ্য ও হেকমত। কারণ মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়া আল্লাহর স্বভাবের মধ্যে গণ্য। আর যিনি আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত হতে পেরেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর খলীফা বা তাঁর প্রতিনিধি হতে পেরেছেন। প্রতিনিধি মানে আল্লাহর স্থলে অভিসিক্ত হওয়া।

সুতরাং তায়কিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি ছাড়া তরীকতের শীর্ষস্থানে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয় কখনো। এই অর্থেই মুর্শিদে কামেলের সংশ্রবে থাকার ফলে পীরের কথাবার্তা ও চাল-চলন মুরীদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। মুরীদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের সার্বক্ষণিক স্মরণ জাগ্রত থাকে। পীরের অনুকরণ করার প্রেরণা পাওয়া যায়। পীরের ভালবাসা থেকেই রাশুলের ভালবাসা লাভ হয় এবং রাশুলের ভালবাসা থেকেই আল্লাহ্র ভালোবাসা পাওয়া যায়।

তরীকত রাজ্যের শিরোমণি গাউশুল আযম শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) বলেছেন, তুমি তো দৃষ্টি শক্তিহীন অন্ধব্যক্তির মত। তাই তুমি আরেফ তথা মুর্শিদে কামেলের অনুসন্ধান কর, তিনি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। তুমিতো অজ্ঞ, তোমার উচিত এমন ব্যক্তির অনুসন্ধান করা, যিনি তোমার জ্ঞানদান করবেন। এমন দিশারীর সাহচার্য লাভ কর এবং তাঁরই আদেশ-নিষেধ মেনে চল। তাঁরই নিকট তরীকতের এই অজানা পথের সন্ধান জেনে নাও। মারেফাতের শীর্ষস্থান লাভ না করা পর্যন্ত তাঁর সাহচর্য পরিহান করো না।

আল্লাহ্র ওলীদের নৈকট্যলাভ ছাড়া আল্লাহ্র নৈকট্যলাভ অসম্ভব।

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে রাশুলাল্হ (সাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ-

হে রাশুল (সাঃ), আপনি লোকদেরকে বলে দিন যে, তোমরা যদি আল্লাহ্র ভালবাসা লাভা করতে চও, তাহলে আমার (মুহাম্মদ (সাঃ)-এর) অনুসরণ কর, আল্লাহ্ রাশুল পাক (সাঃ) এর আনুগত্য করতে মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই যাঁরা রাশুল (সাঃ) এর অনুকরণ ও তাঁর আনুগত্য করে চলবেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই আল্লাহর ভালবাসা লাভ করতে পারবেন। এবং তাঁরাই সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্র ওলী, সূফী, দরবেশ, অভিহিত হয়ে আসছেন। রাশুলের অনুকরণ-অনুসরণ বা তাঁর আনুগত্যের মধ্যে যেমন আল্লাহ্পাকের ভালোবাসা নিহিত রয়েছে, তদ্রূপ নায়েব রাশুলের বা পদানুসারী পীরমূর্শীদের আনুগত্যের মধ্যেও আল্লাহ্ ও তার রাশুলের ভালবাসা নিহিত রয়েছে। কারণ আল্লাহ্র ওলীগণ রাশুলের অনুসরণের মধ্যে দিয়েই আল্লাহ্পাকের মহব্বত লাভ করতে পেরেছেন। কাজেই ওলীদের

অনুসৃত পথেই আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা লাভের একমাত্র উপায়ে ও উপকরণ নিহিত রয়েছে।

বুখারী শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে রাশুলপাক (সাঃ)-এর চেহারা মুবারক দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন যে,

তিনি কে? সুতরাং মৃত ব্যক্তি যদি তার জীবদ্দশায় কামেল পীরের সংশ্রব লাভ না করে থাকে এবং আপন পীরের সৌজন্য আহাদিয়ত ও আহমদিয়ত-এর স্বরূপ উপলব্ধি বা দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য না হয়ে থাকে, তাহলে এহেন অবস্থায় কবরস্থ ব্যক্তি কেমন করে রাশুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাস্তব স্বরূপ জানতে ও চিনতে পারবে? কারণ সে জীবিত বাস্তবরূপ সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করতে হলে মুর্শিদে কামেলের সঙ্গ লাভ করা অত্যাবশ্যক। কারণ মানব বক্ষেই তাওহীদ রূপ বৃক্ষের মূল বা বীজ নিহিত রয়েছে।

এ অর্থেই তরীকতের একটি অন্তর্নিহিত নিয়ম রয়েছে যে, আপন পীরের চেহারা মোবারক ধ্যান করার। এই ধ্যানের মধ্য দিয়েই রাসুলের বাস্তবরূপ জানার ও দেখার সৌভাগ্য লাভ হবে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে আহমদ এবং আহমদ থেকে স্বয়ং আহাদ-এর পরিচিতি লাভ হবে।

আল্লাহর ওলীদের সান্নিধ্য লাভের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যকতাঃ-

যে কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অথবা কামিয়াবী লাভ করতে হলে সে বিষয়ে যেমন কোন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, তদ্রূপ আল্লাহ্‌কে জানা-চেনা এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্যও একজন অভিজ্ঞ দিশারী বা আত্মনিষ্ট-সিদ্ধপুরুষ তথা মুর্শিদে কামেলের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে।

এই অর্থেই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেনঃ-

ওহে বিশ্বাসী মুসলমানগণ, তোমারা একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ভয় কর এবং সত্যনিষ্ট লোকেদের সান্নিধ্য লাভ কর। যেহেতু মহান আল্লাহ্ পাকের ভয়-ভীতি এবং তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে একমাত্র খোদাতত্ত্বজ্ঞ লোক ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে তা জানা সম্ভব নয়। এই জন্যই আল্লাহ্‌র ওলীদের সংশ্রব ছাড়া আল্লাহ্ পাকের স্বরূপ জানা এবং তাঁর নৈকট্য লাভ সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআনের ভাষ্যকারগণ বলেছেন, উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত সাদেকীন শব্দ দ্বারা আল্লাহর ওলী, পীর, মুর্শিদ, গউস, কুতুব, সুফী, দরবেশ লোকদেরকেই বুঝানো হয়েছে। ভাষ্যকারদের এই উক্তিটির সমর্থনে মেশকাত এক হদীসেও পাওয়া যায়। যেমন রাসূলে খোদা (সাঃ) বলেছেনঃ-

আমি কি তোমাকে ঐ বিষয় বলব না, যা ধর্মের পথে খুবই সহায়ক। আর এ দিয়েই তুমি দুনিয়াতে ও আখেরাতে সফলতা লাভ করতে পারবে। আর তা হলো আল্লাহ্‌র ওলীদের সমাবেশে গমন। আর যখন তুমি নির্জনে একাকী বাস কর, তখনো তুমি তোমার রসনা আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত রেখো।

তরিকত পন্থীদের আদব সম্পর্কিত কথাঃ-

১। ঈমান, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, উযূ, গোসল, ঢিলা, কুলুখ, পাক, না-পাক, হালাল-হারাম, মাকরূহ, মোবাহ, ফরয, ওয়াজিব, শুন্নাত, মোস্তাহাব, সত্যকথা, সদ্ব্যবহার সুবিচার, দান-খয়রাত ইত্যাদি বিশেষ বিশেষভাবে অবগত হয়ে শরীযাত অনুযায়ী আমল করবেপ। চুরি, ডাকাতি, যিনা, বেপার্দা ইত্যাদি যে কোন শরীয়াত বিরোধী কাজ হতে সর্বদা বিরত থাকবে, এমন কি মাকরূহ্ তানজিহি ও মোবাহ্ থেকেও পরহেজ করবেন।

২। সর্বদা যথাসাধ্য পীরের সংসর্গে থাকবে ও আল্লাহ্‌র মহব্বত হাসিল করতে যত্নবান থাকবেন।

৩। নিজ পীর থেকে ফায়েজ পাব এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে।

৪। মন, প্রাণ ওমাল দ্বারা যথাশক্তি পীরের খেদমত করবেন।

৫। পীর যা করতে আদেশ করবেন, তা বিনা আপত্তিতে করবেন এবং পীরের আদেশ ভিন্ন কোন কাজের ইচ্ছা অন্তরে রাখবেন না।

৬। পীর যে সমস্ত দোওআ, দুরূদ, অজিফা, যিকির, সবক শিক্ষা দিবেন তা অবশ্য পালন করতে হবে। পীরের অনুমতি ছাড়া অন্য কোন আজিফা আমল করবেন না এতে বরকত নষ্ট হয়।

৭। পীরের সামনে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত এবাদত ছাড়া অপর কোন নফল এবাদত তাঁর বিনা অনুমতিতে করবেন না।

৮। ভাল-মন্দ অন্তরের সকল বিষয় পীরকে অবহিত করবেন। মনঃ পুত না হলেও পীর যা বলেন মান্য করতে হবে কারণ এতে কোন হেকমত থাকতে পারে, য়া বাতেনী ফায়েজ পেশ বুঝতে পারবেন।

৯। পীরের দোষত্রুটির প্রতি খেয়াল করবেন না। পীরের নিকট দুনিয়া হাসিলের জন্য যাবেন না-আল্লাহর মহব্বত যাবেন। নিষ্প্রয়োজনীয় সফরে যাবেন না এতে ইবাদতে ক্ষতি হয়। লজ্জা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করবেন।

১০। পীরের সামনে আদবের সাথে বসবেন, কোনরূপ হেলদোল করবেন না। পীরকে পেছনে রাখবেন না বা পীরের গা ঘেষে বসবেন না। সাহাবাগণ নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এইরূপভাবে যেতেন যেন, তাঁধের মাথার উপর পাখি বসেছে। নবী করীম (সাঃ) যখন উঠে যেতেন তখন তাঁরা মাথা উঠাতেন। নবী করীম (সাঃ) এর সঙ্গে কথা এত মৃদু স্বরে বলতেন যে, হযরত (সাঃ) কান পেতে শুনতেন। এই জন্য পীরের নিকট নিম্ন স্বরে কথা বলবেন।

১১। পীরের আত্মীয়, দোস্ত এবং তাঁর বংশের লোকজনের সাথে তাজিম ও মহব্বতের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন, আর তাদের মধ্যে কেউ ফাসেক বা বদকার হলে তাকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন না। বরং হেদায়েতের জন্য দোওয়া করবেন।

১২। ইরশাদ রূহানি নামক কিতাবে বর্ণিত যে, পীরের খলীফাগণকে পীরের মত সম্মান করবেন এবং তাঁদের আদেশ-নিষেধ পীরের আদেশ নিষেধের মত জানবেন। পীরের অনুমোদিত হালকার আমীরগণকে সম্মান করবেন।

১৩। যিনি পূর্বে মুরিদ হয়েছেন তাকে সম্মান করতে হবে, যদিও তার সবকের উন্নতি না হয়ে থাকে।

১৪। দুনিয়াদারীর কাজে রাগান্বিত হবেন না এবং কোন আলেমের সঙ্গে অনর্থক তর্ক করবো না। এতে কালবের নূর হয়ে নষ্ট হয়ে অন্ধকার হয়ে যাবে।

১৫। যদি কারো সঙ্গে রাগান্বিত অবস্থায় ঝগড়া হয়ে থাকে, তবে ন্যায়সঙ্গত হলেও এতে মাফ নিতে হবে এবং নিজেকে সকলের চেয়ে মন্দ জ্ঞান করতে হবে।

১৬। মুমিন মুত্তাকীগণ হতে সর্বদা দোওয়া নিতে থাকবেন।

১৭। সর্বদা উযূর সাথে থাকার অভ্যাস এবং সর্বদা মুখে তওবা এবং যিকিরের অভ্যাস রাখবেন।

১৮। সর্বদা হালাল ব্যবসা করবেন, ফাসেক লোকের মজলিসে যাবেন না।

১৯। অনর্থক বা অতিরিক্ত কথা বলবেন না। কম কথা, কম নিদ্রা এবং কম পানাহারের অভ্যাসে করবেন নও লোকের সাথে কম মেলামেশা করবেন।

২০। মোবাহ্ বস্তু যাতে নেক-বদ কিছুই নেই পূর্ণ মাত্রায় বর্জন করবেন।

২১। কাশফ্ বা এলহাম হলে খালেস নিয়তে শুধু পীরকে জানাবেন। যাতে নিজের কোন বু.....প্রকাশ না পায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

২২। পীরের চাল-চলন, খানা-পিনা, লেবাস-পোশাক, কথা-বার্তা, আদব-কায়দা অনুয়ায়ী নিজেকে গঠন করবেন।

২৩। যে কোনরূপ কালবের উন্নতি দেখলে, আপন পীর থেকে ফায়েজ আসছে, মনে করবেন, এমন কি স্বপ্নযোগ্য অন্য কোন পীরের ফায়েজ আসতে দেখলে, মনে করতে হবে যে নিজ পীরের কোন পীরের কোন লতিপা অন্য পীরের সুরত ধরে ফায়েজ নিক্ষেফ করছেন।

আমাদের হুজুর কিবলা

এই উপ মহাদেশের বিখ্যাত সুফি সাধক তথা দায়রা শরীফের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের হুজুর কিবলা সৈয়দ মানাল শাহআলকাদেরী আল হাসানী ওয়াল হোসায়নী, হোলেন সারওয়ারে কায়েনাত, সরকারে দো-আলম সৈয়েদেনা ও মওলানা আহ্ম্মদে মুজতাবা মহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এর ৩৫ তম বংশধর এবং পীরানে পীর দাস্তেগীর সৈয়েদেনা হজরত গওশুল আজম (রাঃ) এর সরাসরি ২২তম বংশধর। তিনি হচ্ছেন নাজিবুত তারাফাইন অর্থাৎ পিতৃকূল ও মাতৃকূল উভয় দিক দিয়াই মহানবী (সাঃ) এর বংশধর।

তিনি বিখ্যাত ওলি বংশে জন্মগ্রহন করেন। তিনি মাত্র ৭ বছর বয়সে কুতুবুল ওয়াক্ত, গাওশে জামানা হজরত সৈয়েদেনা শাহ এরশাদ আলি আল কাদেবী আল বাগদাদী (রাঃ) হাতে মুরীদ হন। তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা মাতার কাছ থেকে সূফীবাদ ও ইশলামি শিক্ষা গ্রহন করেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এবং সমস্ত পরীক্ষায় গৌরবোজ্বল স্থান অধিকার করেন।

তিনি এম.এ. আরবী তফসিরে ক্বোরআনি পরীক্ষায় ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট, গোল্ড মেডেলিষ্ট প্রাপ্ত হন। তিনি বিখ্যাত সূফী সাধক আমীর খসরু (রাঃ) এর উপর পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং বহু গবেষনা ধর্মী বই এর প্রনেতা। ইশলামিক টেরিজীম যাহা বিশ্বকে আলোড়িত করেছে ইংরাজী ভাষায় সেই গ্রন্থের প্রনেতা (যা বঙলা ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে) তাঁর অধীনে বহু ছাত্র/ছাত্রী সূফী বিষয়ে বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন।

তিনি একজন আন্তর্জাতিক স্তরের সুবিখ্যাত ব্যক্তি এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা তথা ভাষণ দিয়ে আসছেন তিনি ইরান সরকারের আমন্ত্রনে তেহরান, ইস্পাহান, সিরাজ, মাসহাদ কাজিকিস্তান, বাংলাদেশ সৌদিআরব, জর্ডন ইত্যাদি দেশে পরিভ্রমন করেন এবং বিভিন্ন দেশ বিদেশে সূফী মতবাদের উপর বহু মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

অনেক সময় তিনি কোন মুরীদ মুসিবতে পড়লে ওয়াজীফা শিখিয়ে দেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে টাকা পয়সার লোভ আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বড়ই প্রতিবন্ধক। তিনি জীবন ধারনের জন্য সম্মানজনক পেশা শিক্ষকাতাই বেছে নেন। তিনি ১৯৬৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ফারসী বিভাগের লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত হন। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান জনক স্যার আশুতোষ প্রফেসার অফ ইশলামিক কালচার পদটি অলঙ্কৃত করেন। তাঁর অসাধারণ মানব সেবার স্বীকৃতি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। তিনি মনে করেন এই পদগুলি কিছুই না, সব কিছুই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের রহমত ও হজরত গাওশুল আজম (রাঃ) দোওয়া। আবার তিনি রাশিয়ার উজবিকিস্থানের নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করেছেন। তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা কুতুবে বাঙালাসেয়েদেনা মওলানা সৈয়েদ শাহ গোলাম মোস্তাফা হজরত আলকাদেরী, আল-বাগদাদী আমাদের হুজুর কিবলাকে খিলাফত দান করেন এবং মেদিনীপুরের উরুশ পাকে হাজার হাজার ভক্ত ও শিষ্যদের মাঝে এই ঐতিহাসিক মূল্যবান ঘোষণাটি ব্যক্ত করেন। (তাঁর সুমধুর কন্ঠস্বর ক্যাসেট বহু মুরীদের কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে।)

সুলতানুল মাশায়েখ, মেহেবুবে এলাহী হজরত নিজামুদ্দিন আওলিয়ার (দিল্লী) সাজ্জাদানশীন হজরত পীর জামীন নিজামী সৈয়দ বোখারী (রাঃ) সিলসিলায়ে চিস্তিয়া, নিজামিয়া, ফাখরিয়া, সোলায়মানীয়া স্বহস্তে সই ও স্বাক্ষর দ্বারা আমাদের হুজুরকে খিলাফত দান করেছেন। ইনার বিবাহ হয় দিল্লীর নিজামুদ্দিন আওলিয়ার পৌত্রের কন্যার সহিত। ইনি দিল্লীর নিজামুদ্দিন-এর উত্তরাধিকারী।

বিহারের বিখ্যাত সুফী সাধক সৈয়েদেনা সরফুদ্দিন ঈয়াহীয়া মুনিরি (রাঃ) যিনি মাকদুমই-জাহান নামে পরিচিত। তাঁরই সুযোগ্য বংশধর মাকদুমই জাহান হজরত ইমাম আহমদ শরাফি আমাদের হুজুর কিবলা কে সহি ও স্বাক্ষর দ্বারা খিলাফত দান করেছেন। সমস্ত খিলাফত নামা সাধারণ মানুষের জিয়ারতের জন্য দায়রা শরীকে সুরক্ষিত আছে।

খলীফাঃ-

খলীফা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধি।ক্বুরআন শরীফে খলীফা শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

হজরত আদম আলায়হে সালাম এর প্রতি শুরা বাক্বারায় উল্লেখ আছে-যখন আপনার প্রভু ফেরেস্তাদের বললেন আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করছি-অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তায়ালার প্রথম প্রতিনিধি হচ্ছেন হজরত আদম আলাইহে সালাম। শুরা স্বোয়াদে দাউদ আলাইহে সালামের প্রতি উল্লেখ আছে- হে দাউদ তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বা খলীফা করছি। তাই তুমি লোকেদের মধ্যে সুবিচার কর।

সূরাহ আন আমে উল্লেখ আছে-'তিনিই তোমাদের প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।'

শুরাহ আরাফাতে উল্লেখ আছে'-এবং স্মরন কর আল্লাহ তোমাদের নূহের দলের স্বলাভিষিক্ত খলিফা করেছেন এবং তোমাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি

বৃদ্ধি করেছেন এবং আদমজাতীর পর তিনি তোমাদের তাদের খলীফা করেছেন।

সুফী সম্প্রদায়ের শাইখ, পীর বা প্রতিনিধিকে খলীফা বলা হয়। এই তরীকায় আধ্যাত্মিক শক্তির উত্তরাধিকারী কেই খলীফা বলে চিহ্নিত করা হয়।

রাসুলে পাক (সাঃ)এর পরে উনার সাহাবারা বিশেষ করে মওলা মুসকিল কোসা হযরত আলি মোর্ত্তোজা (আঃ) ইসলামের এবং রূহানীয়াতের প্রচারের জন্য, যাকে উপযুক্ত মনে করেছেন তাকে নিজের খলীফা কিংবা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। উনার পরে হযরত হাসান (আঃ) এবং হুসাইন (আঃ) উনার রূহানী জগতের খলিফা হলেন। এরপরে তাঁরা যাকে সুযোগ্য মনে করতেন তাদেরকে খিলাফত দান করতেন। কিছু বংশ পরমপারায় এবং কিছু উপযুক্ত দেখে তারা নিজের খিলাফত দান করেলেন। এখনও যারা খিলাফত প্রাপ্ত আছেন তারা যোগ্যতা দেখে নিজের খিলাফাত এবং মুরীদ কারার জন্য এযাযত দান করেন যাতে মানুষ শরীয়ত এবং তরীকত সম্পর্কে জানতে পারে এবং সেই পথে চলতে পারে। অতএব সমস্ত তরীকার (সিলসিলা) মধ্যে খলিফায় হল আসল পথপ্রদর্শক, এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উত্তরাধীকারী।

আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দা যাহারা এবাদৎ ও রিয়াজাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার হয়ে যান, তাঁহারা সাধারণতা দু-ধরনের হয়ে থাকেনঃ-

জামালীঃ-

যাহারা সর্বদা মানুষের উপকার করে থাকেন এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন। আর সর্বদা তাঁহারা মানুষকে সিরাতুল মোস্তাকীমের পথে চলার পরামর্শ দান করেন। মানুষের কী ভাবে সৎ ও সত্য পথের পথিক করা যায় ও তাদের দুঃখ কষ্ঠ লাঘব করা যায় তার জন্য সচেষ্ঠ থাকেন।

জালালীঃ-

এই সব আল্লাহর নেক বান্দারা সর্বদা সচেষ্ঠ থাকেন যাহাতে মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালার পথে চালীত করা যায়। সত্যের প্রতি আহবান জানান ও মিথ্যা হতে দুরে রাখেন, আবার প্রয়োজনে আল্লাহ তায়ালার আদেশ সমুহকে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পিছপা হন না, এবং কোন বেয়াদবী ও গোস্তাখী বরদাস্তও করেন না।

হেকায়ৎঃ-

কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজের সহধর্মিনীকে সঙ্গে নিয়ে কোন এক সম্ভ্রন্ত পরিবারের নিমন্ত্রন রক্ষার্থে রওনা হয়ে ছিলেন। ব্যক্তিটির পরনে ধোপ দস্তর সাদা পাঞ্জাবী ও ধুতী ছিল এবং তার স্ত্রীর পরনে ছিল খুব দামী ও সন্দর এক বেনারসী শাড়ী। তাদের রওয়ানার কিছু পূর্বে বৃষ্টি হওয়ায় তারা খুব সাবধানে পথ চলছিল কারন মাটির রাস্তায় বিভিন্ন গর্তে কাদা জমে ছিল। এমতাবস্তায় পথে এক বৃদ্ধ লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বৃদ্ধ লোকটির পা একটি ছোট গর্তেপড়ে যায় তা থেকে কাদা জল ছিটকে স্ত্রী লোকটির দামী বেনারসী শাড়ীতে লেগে যায়। ফলে ভদ্রলোকটি রাগান্নীত হয়ে এবং বৃদ্ধ লোকটিকে থাপ্পড় মেরে কর্কষ ভাবে বৃদ্ধ লোকটিকে বলতে থাকে অন্ধ কোথাকার, দেখতে পাসনা? তোর জন্য আমার স্ত্রীর দামী শাড়ী তে কাদা লেগে গেল। তখন সেই বৃদ্ধ লোকটি বলতে থাকে-হ্যাঁ বাবা আমি সত্যেই অন্ধ আমাকে ক্ষমা করে দাও। দেখতে না পেয়ে গর্তে পা দিয়ে ফেলেছি ফলে তোমার স্ত্রীর শাড়ীতে কাদা লেগে গেছে।

এর পর সেই লোকটি তাঁর স্ত্রীকে নিকটস্ত একটি টিউব কলের কাছে নিয়ে যায় এবং কাদা গুলো শাড়ী থেকে ধুয়ে ফেলে পরে নিজের হাত ধুতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায় ফলে তার একটি পা ভেঙে যায় এবং যন্ত্রনায় কাতরাতে থাকে। ইত্যবসরে সেই বৃদ্ধ অন্ধ লোকটি সেই টিউপ কলের নিকটে উপস্থিত হলে সেই ভদ্রলোকটি পুনরায় বলতে থাকে তোর বদদোয়ার ফলেই আমার পা ভেঙে গেল। তখন বৃদ্ধ, অন্ধ লোকটি বলতে থাকে-আচ্ছা বলতো, তুমি যখন আমাকে থাপ্পড় মেরেছিল তখনকি তোমারঃ স্ত্রী তোমাকে তা মারতে বলেছিল? নিশ্চই বলেনি? যদিও কাদা তারই শাড়ীতে লেগেছিল। কিন্তু তুমি রাগে অন্ধ হয়ে আমাকে থাপ্পর মেরে ছিল। সেই রুপ মহান আল্লার কাছে তোমাকে শাস্তি দোওয়ার জন্য আমাকে বদদোয়া করতে হয়নি,

আল্লাহ তায়ালা নিজেই তোমাকে শাস্তি দিয়েছেন।

সারমর্মঃ-

আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা-বান্দীদের উপর অন্যায় অত্যাচার, বেয়াদবী ও গোস্তাখী করলেও তাহারা বদদোয়া করেন না, তবে আল্লাহপাক এসব বরদাস্ত করেন না বরং শাস্তি প্রদান করে থাকেন। শহী বুখারী শরীফের হাদীসে কুদশীতে আছে 'আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষনা করেছেন-যে আমার ওলিদের সঙ্গে দুশমনী রাখে, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করছি।'

দোয়ার বরকতঃ-

হাওড়া জেলার বাগনান থানার বাসিন্দা ইদরিস মিঞার মেজ ছেলে তার বাবার থেকে কিছু টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে এবং বছর খানেকের মধ্যে বেশ ভালোই উন্নতি করে, তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতি দেখে তাঁর এক আত্মীয় তাঁকে পাঁচ লক্ষ টাকা ধার হিসাবে প্রদান করে যাকে ব্যবসাটিকে আরোও বৃহদাকারে চালাতে পারে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়ের লেনদেন দেখে সন্তুষ্ঠ হয়ে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার তাকে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়ার প্রস্তাব দেন। এমতাবস্তার ছেলেটি হুজুরপাকের নিকট গিয়ে ব্যাঙ্কের লোনের প্রস্তাবে ব্যাপারে হুজুর পাকের পরামর্শ/উপদেশ চান। হুজুর পাক তাঁকে বলেন-ব্যাঙ্কের লোন নিওনা, ব্যাঙ্কের লোন ছাড়াই তুমি তোমার ব্যবসা চালতে থাকো। ইনশাআল্লাহ তোমার অসুবিধা হবেনা।

হুজুর পাকের নিষেধ সত্বেও ছেলেটি ব্যাঙ্কের প্রলোভনে পড়ে দশ লক্ষ টাকা লোন নিয়ে ফেলে পরিবর্তে তাঁকে তাঁর বসত বাড়ী মর্টগেজ রাখতে হয়।

যাইহোক কিছুদিন এভাবে চলার পর দেখা গেল ব্যবসায়ে আর তেমন লেনদেন হচ্ছেনা ফলে তাঁর মুলধন প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করার মতো টাকাও তাঁর কাছে নেই। ফলে ব্যাঙ্ক বাধ্য হয়ে মর্টগেজ ক্রীত বসত বাড়ীটি নীলামের ব্যবস্থা করে তাদের টাকা তুলে নেওয়ার জন্য উদ্যেগী হয়। ফলে ছেলেটি ভীষণ বিপদে পড়ে দায়রা শরীফের এসে হুজুর পাকের নিকট সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে। সব শুনার পর হুজুর পাক তাকে বলেন-'তোমাকে বললাম ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিওনা, তবুও লোন নিলে, এখন মহাবিপদে পড়লে তো! তোমার একাজ করা উচিৎ হয়নি। যাইহোক আল্লার কাছে দোয়া করছি, তিনি নিশ্চই একটা হিল্লা করে দেবেন। হুজুর পাকের দোয়ার ও আল্লার রহমতে ধীরেধীরে ছেলেটির ব্যবসায় আবার উন্নতি দেখা দিলে এবং পরে সে ব্যাঙ্কের টাকা পরিশোধ করে নিজেদের বাস্তুভীটাকে নীলাম থেকে মুক্ত করে ফেলেছিল। উপরন্তু সে একটা ভালো চাকরীও পেয়ে গেল। বর্তমানে সে তাঁর চাকরীতে বেশ উন্নতি করে বেশ ভালো ভাবে জীবনযাপন করছে।

২। ইংরাজী ২৯ শে জুলাই মেদিনীপুর জেলার শ্যামল ঘোষ (পুলিশলাইন) যিনি একজন প্রাক্তন মন্ত্রীর পুত্রসম। ইনি আমার হুজুর পাক্‌কে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। কোন কার্যোপলক্ষ্যে অত্মীয় ও বন্ধু সহ উড়িষ্যা যাবার প্রয়োজন হয়। এবং সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে টাটা সুমোতে যাবেন। তাই ঘোষ বাবু হুজুর পাকের নিকট আসিয়া সমস্ত বিষয় অবগত করান। হুজুর পাক সব বৃত্যান্ত শুনে ঘোষবাবুকে বলেন বাবু ট্রেনে করে যাও ঐ টাটা সুমোতে যাবেনা। ঘোষ বাবু ফিরে এসে সকলকে বললেন-কিন্তু সবার জেদ টাটাসুমোতেই যাবেন। বাধ্য হয়ে ঘোষ বাবু স্বীকার করে নেন ও টাটা সুমোতে সকলে একসাথে যাত্রা করেন। পথি মধ্যে গাড়িটি হাইওয়ের উপর বেলদা রোডে হঠাৎ ব্রেক ফেল হওয়ায় রাস্তা থেকে প্রায় ২০ (কুড়ি) ফুটে নীচে গাড়ি উলটিয়ে পড়ে যায়। এবং কয়েকটি পাল্টি খেয়ে যায়। সকলেই প্রায় গরুতর আঘাত হয়। কারো মাথা ফাটে, কারো হাত ভাঙে কারো বা পা ভাঙে এই অবস্থায় সবাই পড়ে থাকে কিন্তু ঘোষ বাবু অর্থাৎ শ্যামল বাবু অক্ষত অবস্থায় আছেন। তখন প্রায় রাত সাড়ে তিনটা ভোর হয়ে এসেছে হুজুর পাক ফোন করছেন আর জানতে চাইছেন উনার অর্থাৎ শ্যামল বাবুর কোথাও চোট লেগেছে কিনা। উত্তরে শ্যামল বাবু জানাচ্ছেন হুজুর বেয়াদবী করে ফেলেছি এখন সবাইকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি। আমার কোন রূপ আঘাত লাগেনি, আপনার দোয়ায় আমরা বেঁচে আছি দোওয়া করুন সবাইকে নিয়ে যেন ফিরে যেতে পারি।

৩। মেদনীপুর জেলার গোলশানির বজলুর রহমান মিঞার ছোট ছেলের

ক্যানসার হয়। ডাক্তারগণ সবাই বজলুর রহমানকে বলেন যেহেতু পেটে ক্যানসার প্রমান পাওয়া গেছে অতএব এর যা চিকিৎসা হোক না কেন সুস্থ্য হওয়ার লক্ষন নাই। এই সব শুনে বজলুর মিঞা বেশ নার্ভাস হয়ে যান। এর ২/৪ দিন বাদে কি মনে হয় ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় দায়রাশরীফে এসে হুজুর পাক্‌কে বলেন ছেলেকে আপনার কদমে ফেলে দিলাম আপনি দেখুন আমাদের কিছু আর করার নেই। ডাক্তারগণ বলেছেন ক্যানসার যখন এ সুস্থ্য হবে না। তবে আর কি করব আপনি যা হয় করুন। হুজুর পাক বজলুর মিঞাকে বললেন বাবা তোমার ছেলে নিশ্চয়ই বাঁচবে আর সুস্থ্য হয়ে যাবে আল্লাহ পাক নিশ্চয় তোমার ছেলের অসুখ সারিয়ে দিবেন। আমি আল্লাহ পাককে জানাচ্ছি। তিনি আমাকে নিশ্চয় বেইজ্জত করবেন না। পানি নিয়ে এসো দম করে দিই। আর পুনরায় ডাক্তারের নিকট দেখাও বল হুজুর পাক বলেছেন আপনার ঔধধ দেন। সেই মত বজলুর মিঞা ডাক্তারদের বললেন। আর ডাক্তার বাবু পুনরায় ঔষধ দিলেন। এখন বজলুর রহমান মিঞার ছেলে সুস্থ্য।

৪। হুগলী জেলার আরামবাগ থানার বেউড় গ্রামের আধিবাসী রহমত খাঁন। ইনার এক ছেলের অসুখ করে গোটা ফুলে যায়। ডাক্তার দেখান, ডাক্তারবাবু উনাকে অনেক কিছু পরীক্ষা করতে বলেন গরীব মানুষ আত্মীয় স্বজনদের থেকে সাহায্য নিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করান। পরীক্ষার পর ডাক্তার বাবু বলেন আপনার ছেলের দুইটা কিডনী খারাপ হয়ে গেছে। কিডনী বদলানো ছাড়া কোন উপায়নাই। বেচারা রহমত মিঞা এই কথা শুনা মাত্র কেঁদে আকুল এমনি অনেকের মুখে শুনছেন কিডনী হঠাৎ করে পাওয়া যায় না। যদিও নিজের একটা কিডনী দিয়ে ছেলেকে বাঁচাবে কিন্তু অপারেশন ও ঔষধ এ পয়সা? কোথায় কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারেন না। অবশেষে পাড়ার কয়েক জনের পরামর্শে পাড়ারই একজনের সাথে কলকাতা দায়রা শরীফে এসে হাজির হলেন হুজুর পাকের কাছে। হুজুর পাক্‌ ঐ ছেলেকে এবং ছেলের আব্বা ও প্রতিবেশী সবাইকেই দায়রা শরীফে থাকতে বললেন। আর একটা মাদুলি দিলেন ও পানি দম করে দিলেন। চার দিনের মধ্যেই ছেলের হাত, পা এর ফোলা কমে গেল। হুজুর পাক বললেন যান ভাই আপনার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যান আল্লাহ পাক আমার কথা রেখেছেন ইন্‌সাআল্লাহ তায়ালা আপনার ছেলে ভাল হয়ে যাবে। দেখা গেল এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ্য। এখন সে সাধারন ছেলেদের মতই স্বাভাবিক হয়েগেছে।

৫। হুগলী জেলার বেউড় গ্রামের আবুল রহমান খাঁন হুজুরের মুরীদ উনি বাড়ি থেকে বাসে করে এসে হাওড়াতে বাস বদল করে দায়রা শরীফে আসার জন্য বাস ধরে আসছেন কাছে যা টাকা পয়সা কিছু আছে। পার্কসার্কাসের কাছাকাছি কিছুলোক বাসে উঠলেন তারপর বাসটায় বেশ ভীড় হয়ে গেল উনিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসছেন। হঠাৎ ৪/৫ জন লোক উনাকে ঠেলা ঠেলি আরম্ভ করে দেয়। উনি ঠেঁসে থাকেন আর বলতে থাকেন আরে ভাই এমন করছো কেন। আর ভয়ও লাগে। তখন মনে মনে হুজুর পাক্‌কে ডাকতে থাকেন, আর বুঝতে পারেন এরা পকেট মার তাই আর কিছু না বলে একমনে হুজুর পাককে স্মরণ করতে লাগলেন এমন সময় দলের এক সঙ্গি রহমান মিঞার হাতধরে নামাতে যায় রহমান মিঞা নিজের হাতে টান দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে। আর ওদের একজন বলে তুমি কোথা যাবে। তখন রহমান মিঞা বলে আমি পীরের দরবারে যাচ্ছি দায়রা শরীফে তারপরই লোকগুলি চলে গেল। বাসের সমস্ত লোক তখন বলতে থাকেন রহমান মিঞাকে পকেটে টাকা আছে তো কেননা পকেট মার বার বার পকেটে হাতদিচ্ছে আর বার করছে। এটা সবাই দেখেছে বাসের লোকেরা আবার জিজ্ঞাসা করেন উনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর শুনে বলেন তোমার পীর কিন্তু সত্যই কামেল পীর। এরপর রহমান মিঞা দায়রা শরীফে পৌঁছালেই হুজুরপাক বলেন ভাই আপনার টাকা পয়সা নেয়নিতো এই বলে উনার পিঠে হাত বুলাতে থাকেন। মুরীদ সদাই পীরের ছায়ায় থাকে।

বেয়াদবীর ফলঃ-

১। হুগলী জেলার আরামবাগের এক ব্যক্তি ইন্টিরিওর ডেকরেটার এর কাজ করত, আমাদের হুজুর পাকের নিকট আসা যাওয়া করার ফলে হুজুরের স্নেহধন্য হয়ে উঠেন। হুজুর পাকের দোয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির ইন্টিরিওর ডেকরোটারের ব্যবসায়ে বরকত দান করেন ফলে তাঁর

ব্যবসাটি অচিরেই বেশ বড়-সড় আকার ধারন করে। এই ভাবে বছর কয়েক যাওয়ার পর ঐ ব্যক্তিটির মনে এক প্রকার অহংকারের সৃষ্টি হয়। টাকার গর্বে গর্বিত হয়ে উঠে। আস্তে আস্তে সে এমন ভাব দেখাতে থাকে যেন সে দায়রা শরীফের এক জন বিরাট ব্যক্তি। এবং দায়রা শরীফ তাঁর কথা মতো চলে। সঙ্গে সঙ্গে সে অনেক কিছু বেয়াদবীর পরিচয় দিতে থাকে। কিন্তু হুজুর পাক সব কিছু অবগত হয়েও ভালোবাসার খাতিরে মার্জনা করে দিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যেবশত সেই ব্যক্তি নিজের বেয়াদবীর মাত্রা খুব বেশী বাড়াতে থাকলে, আমাদের হুজুর পাক তাকে বোঝাতেন এবং সাবধান করে বলতেন - 'দায়রা শরীফের সম্মান নষ্ঠ হয় ইসলাম বিরুদ্ধ হয় এমন কাজ করবে না বাপু। দায়রা শরীফের সম্মান রক্ষা করা সকলের কর্তব্য। যাইহোক হুজুরের বোঝানোর পরেও সেই ব্যক্তি নিজের অপকর্ম বন্ধ না করায় এক প্রকার বাধ্য হয়েই হুজুর পাক নিজেক এবং দায়রা শরীফের সম্মান রক্ষার্থে সেই ব্যক্তিটি কোন রূপ শাস্তি না দিয়ে এক প্রকার ভালোয় ভালোয় দায়রা শরীফ থেকে বিদায় করেন।

তবে আল্লাহপাক হয়তো সেই ব্যক্তিটিকে হুজুর পাকের প্রতি বেয়াদবী ও দায়রা শরীফের অসম্মান করার জন্য মাফ করেননি। দায়রা শরীফ থেকে যাওয়ার পর তাঁর ব্যবসায়ে অবনতি দেখা দিল। কাজের বরাত পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কাজের লোকের কাজ না থাকায় চলে গেল, অবশেষে তার ব্যবসাটি বন্ধ হয়ে গেল। ফলে বর্তমানে সেই ব্যক্তিটি সহায় সম্বলহীন অবস্থায় খুলো বেড়ায়।

২। এখন যেখানে দায়রা শরীফ অবস্থিত পূর্বে সেখানে টালীর ছাদ দেওয়া কিছু বাড়ী ছিল, যখন হুজুর পাক সেই বাড়ি গুলো জায়গা সমেত ক্রয় করেন তখন তিনি জানতেন না যে ঐ বাড়ী গুলোর একটিতে এক মস্তো বড়ো গুন্ডা বাস করে।

আপনাদের অবগতের জন্য জানাই যে - কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইন্স চ্যান্সেলর কলিকাতার বিখ্যাত গুন্ডাদের উপর একটি বই লেখেন। বইটির নাম দেন -"The Gundas" এবং উল্লেখ যোগ্যভাবে সেই বইটিতে হুজুর পাকের কেনা টালীর বাড়ীতে থাকা গুন্ডাটির নাম, যাইহোক হুজুর পাক যখন বর্তমান দায়রা শরীফটি নির্মান করতে যান তখন সেই গুন্ডাটি বারে বারে বিভিন্ন অজুহাতে নির্মান কাজে বাধাদান করতে থাকে এমনকি হুজুর পাকের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলাও দায়ের করে। হুজুর পাক তাকে ডেকে বারে বারে বোঝাতেন যে সে তার প্রাপ্য অবশ্যই পাবে। হুজুর পার বলেন 'তুমি আমাকে আমার দায়রা শরীফ বানাতে দাও চাইনা। অবশেষে যখন দায়রা শরীফ তৈরী হয়ে গেল তখন হুজুর পাক নিজের কথা মতো সেই লোকটিকে কিচেন ও বাথরুম সমেত একটি Flat দিয়ে দেন। কিন্তু হুজুর পাকের সরলতা ও উদারতার সুযোগ নিয়ে সেই লোকটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে হুজুর পাকের নিকট বিভিন্ন দাবী দাওয়া করতে থাকে এবং হুজুর পাককে কষ্ট দিতে থাকে। হুজুর পাক সব সহ্য করতে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ পাক হয়তো হুজুর পাকের প্রতি এরূপ অত্যাচার সহ্য করলেন না। সেই লোকটির উপর বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদ আসতে লাগল। এমনকি তার দুই জোয়ান ছেলে অসময়ে মারা গেল। পরে তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে এমন গন্ডোগোল বাধলো যে তাদের সংসার ভেঙে গেল। এতো সব কিছুর পর সেই লোকটি ভুল বুঝতে পেরে হুজুর পাকের পায়ে এসে পড়ল এবং ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে বরাবরের মতো চলে গেল।

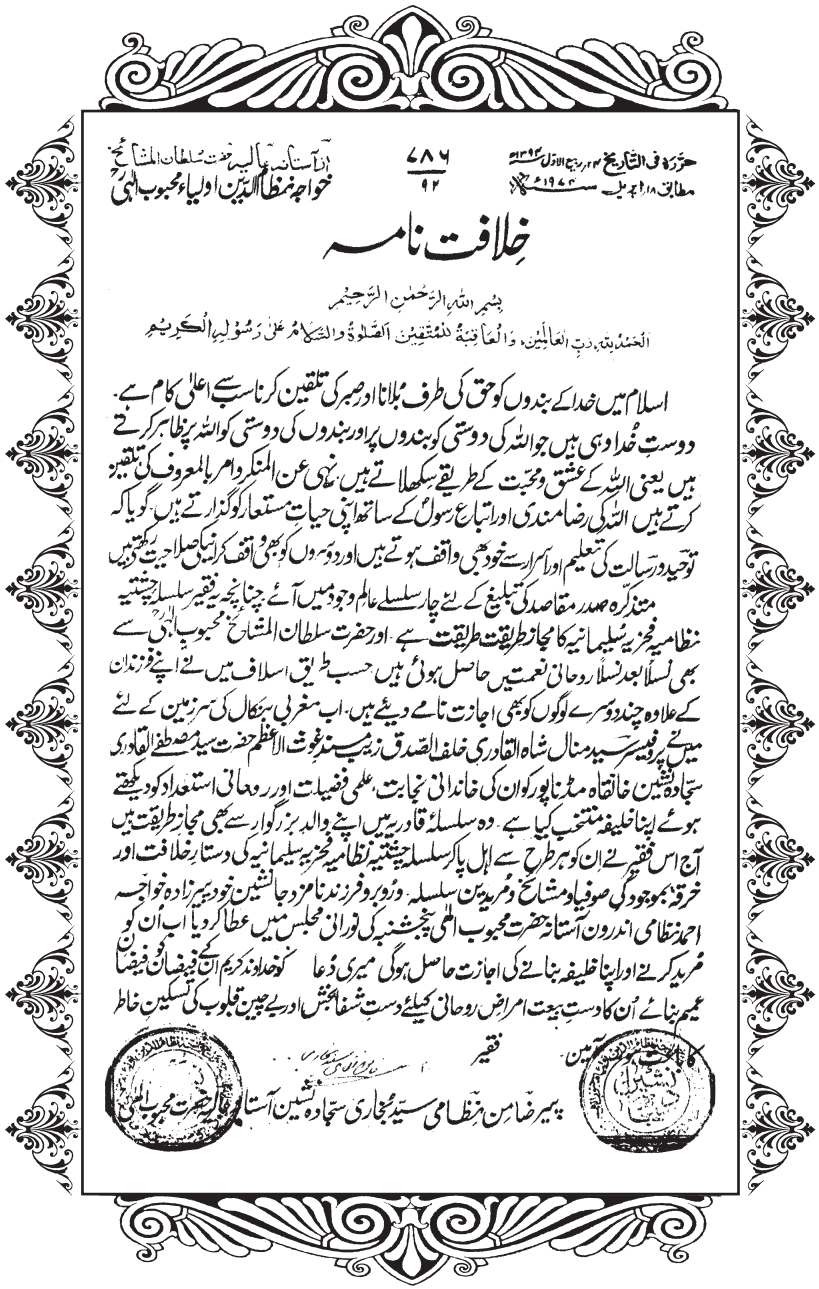

از آستانہ عالیہ حضرت سلطان المشائخ
خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الٰہی

۴۸۶
۹۲

حررہ فی التاریخ ۲۴ ربیع الاول ۱۳۹۴ھ
مطابق ۱۸ اپریل ۱۹۷۴ء

خلافت نامہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین الصلوٰۃ والسلام علی رسولہ الکریم

اسلام میں خدا کے بندوں کو حق کی طرف بلانا اور صبر کی تلقین کرنا سب سے اعلیٰ کام ہے۔ دوستِ خدا وہی ہیں جو اللہ کی دوستی کو بندوں پر اور بندوں کی دوستی کو اللہ پر ظاہر کرتے ہیں یعنی اللہ کے عشق و محبت کے طریقے سکھلاتے ہیں۔ نہی عن المنکر و امر بالمعروف کی تلقین کرتے ہیں اللہ کی رضامندی اور اتباعِ رسولؐ کے ساتھ اپنی حیاتِ مستعار کو گذارتے ہیں۔ گویا کہ توحید و رسالت کی تعلیم اور اسرار سے خود بھی واقف ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی واقف کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں
متذکرہ صدر مقاصد کی تبلیغ کے لئے چار سلسلے عالمِ وجود میں آئے۔ چنانچہ یہ فقیر سلسلۂ چشتیہ نظامیہ فخریہ سلیمانیہ کا مجازِ طریقت ہے۔ اور حضرت سلطان المشائخ محبوب الٰہیؒ سے بھی نسلاً بعد نسلاً روحانی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ حسبِ طریق اسلاف میں نے اپنے فرزندان کے علاوہ چند دوسرے لوگوں کو بھی اجازت نامے دیئے ہیں۔ اب مغربی بنگال کی سرزمین کے لئے میں نے پروفیسر سید منال شاہ القادری خلف الصدق زیبِ مسندِ غوث الاعظم حضرت سید مصطفےٰ القادری سجادہ نشین خانقاہ مدنا پور کو ان کی خاندانی نجابت، علمی فضیلت اور روحانی استعداد کو دیکھتے ہوئے اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے۔ وہ سلسلۂ قادریہ میں اپنے والد بزرگوار سے بھی مجازِ طریقت ہیں
آج اس فقیر نے ان کو ہر طرح سے اہل پاکر سلسلۂ چشتیہ نظامیہ فخریہ سلیمانیہ کی دستارِ خلافت اور خرقہ بموجودگی صوفیا و مشائخ و مریدین سلسلہ۔ و روبرو فرزند نامزد جانشین خود پیرزادہ خواجہ احمد نظامی اندرون آستانہ حضرت محبوب الٰہی پنجشنبہ کی نورانی مجلس میں عطا کر دیا اب ان کو مرید کرنے اور اپنا خلیفہ بنانے کی اجازت حاصل ہوگی میری دعا ہے کہ خداوند کریم ان کے فیضان کو فیضانِ عمیم بنائے ان کا دستِ بیعت امراضِ روحانی کیلئے دستِ شفا بخش اور بے چین قلوب کی تسکینِ خاطر کا باعث ہو۔ آمین

فقیر

پیر ضامن نظامی سید مجاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت محبوب الٰہی

মেহেবুবে এলাহি হজঃ খাজা নিজামউদ্দিন আওলিয়া রঃ এর আস্তানা শরিফ।

২৪ শে রবিউল আওয়াল ১৩৯৪, হিজরী
ইং. ১৮ই এপ্রিল ১৯৭৪ সাল

খেলাফত নামা

ইসলাম ধর্মে আল্লাহর রাস্তায় আহাব্বান করা ও ধর্য্যের শিক্ষা দেওয়া সব থেকে উত্তম কাজ, আল্লার বন্ধু সেই, যে আলার প্রতি ভালবাসা মানুষকে শেখায়, এবং নিষেধিত, ও নির্দেশিত শিক্ষা মানুষকে দেয়।

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছানুসারে ও রসুলে পাক সাঃ পথ অনুসরণ করে নিজেরা চলেন এবং অপর কেও সেই পথে চালিত করার ক্ষমতা রাখেন, উপরুক্ত নির্দেসের পালন ও প্রচারের জন্য-৪ টে শিলশিলা এসেছে, এই ফকির (আমি) সিলসিলায়ে চিস্তয়া, নিজামিয়া, ফখরিয়া, সোলেমানিয়া, খেলাফত প্রাপ্ত এবং সুলাতানুল মশায়েক মেহেবুবে এলাহি এর নিকষ্ট হইতে বংশ পরামপরা রুহানি নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি। আমাদের পূর্বপুরুষের নিয়মানুসারে আমি আমার সন্তান ছাড়াও অপর কিছু উপযুক্ত ব্যক্তিকেও খেলাফতের হুকুম দিয়েছি। এখন আমি পশ্চিম বাংলার বুকে হজরত সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা আল কাদেরী সাজ্জাদা নশিন খানকাহ শরীফ মেদিনীপুর এর সুযোগ্য সন্তান ও খলিফায়ে বারহক প্রফেসর ডাঃ মানাল শাহ আল কাদরীর বংশিও অভিজাত্য ও অসাধারণ পান্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দেখে নিজ খলিফা নিযুক্ত করলাম। উনি কাদেরীয়া সিলসিলাতে নিজ পিত্রদেবের নিকট থেকেও খেলাফত প্রাপ্ত হয়েছেন। আজ এই ফকির ইনাকে সর্বদিক দিয়ে উপযুক্ত পেয়ে সিলসিলায়ে চিস্তিয়া, নিজামিয়া, ফকরিয়া, সোলেমানিয়ার খেলাফত ও খেরকা বিভিন্ন আধ্যাতিক জগতের পীর। সুফি, ও মুরিদ গণের উপস্তিতে ও আমার ছেলে পীর জাদা খাজা আহমদ নিজামির সামনে। মেহেবুবে এলাহির মাজার মোবারকের ভেতরে, বৃহস্পতিবারের নুরানী মজলিশের মধ্যে প্রদান করলাম।

এখন থেকে উনি মুরিদ করার ও খেলাফতি প্রদান করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেন। উনার ওপর আমার দোওয়া থাকলো উনি যেন অস্থির হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ করেন।

আমিন

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

اعلان خلافت

شہزادہ غوث الورٰی حضرت قطب بنگالہ سیدنا مولانا سید شاہ غلام مصطفٰے حضرت القادری البغدادی علی جدہ نبینا علیہ السلام کا شہر مدنی پور میں سالانہ عرس شریف کے موقع پر ہزاروں مریدین و معتقدین کے سامنے تاریخی معرکۃ الآرا اعلان خلافت ۔

اے پروردگار عالم میرے بچوں کو کمال و نوال و منال و جلال و جمال و جمیل کی حیات دراز کر تیرا کرم ہو تیرا رحم ہو ان لوگوں کے سروں پر ۔ یہ لوگ جیسا شمس و قمر بن کر چمکیں اور طریقہ قادریہ کو زندہ رکھیں

سب بچوں کو میں نے اجازت دے دی خلافت دیدی ۔
چاروں لڑکوں کو یہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں اپنے طریقہ قادریہ کو پھیلائیں ۔ ان کی حیات دراز ہو ان لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر ان کو صحت نصیب ہو ؎

খেলাফত নামা

আওলাদে গওসুলআজম কুতবে বাঙ্গালা হজঃ সৈয়েদেনা, মৌলানা সৈয়দ গোলাম মোস্তফা হজঃ আল কাদেরী আল বাগদাদি (রাঃ)এর মেদিনীপুর শহরের খানকা শরীফের বাৎসরিক ওরশ শারিফে হাজার হাজার মুরিদ গনের উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক বক্তাব্যে দেওয়া খেলাফত নামা।

হে মহান আল্লাহ পাক তুমি আমার সন্তান গন কামাল, নাওয়াল, মানাল, জেলাল, জামাল, ও জমিল, কে দির্ঘ জিবি করুণ, রহম ও করম, ওদের উপরে বর্ষণ করুণ, এরা যেন সূর্য ও চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকে এবং কাদেরীয় তরীকাকে জিবিত রাখে।

আমি উপরুক্ত ৪ সন্তান কে ইজাজত ও খেলাফতের হুকুম দিলাম এরা যেন আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় থাকে ও কাদেরিয়া তরীকাকে ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত করে। আল্লাহ তুমি ওদিকে দির্ঘজিবি করো সু স্বাস্থ দাও, এবং বিপদ থেকে মুক্ত রেখো।

আমিন

হাজঃ সৈয়দ গোলাম মোস্তফা আল কাদেরী

বিঃদ্রঃ- এই ঐতিহাসিক বক্তব্য দায়েরা শরীফে ক্যাসেট করা আছে। প্রয়োজনে নিম কানে শুনতে পারেন।

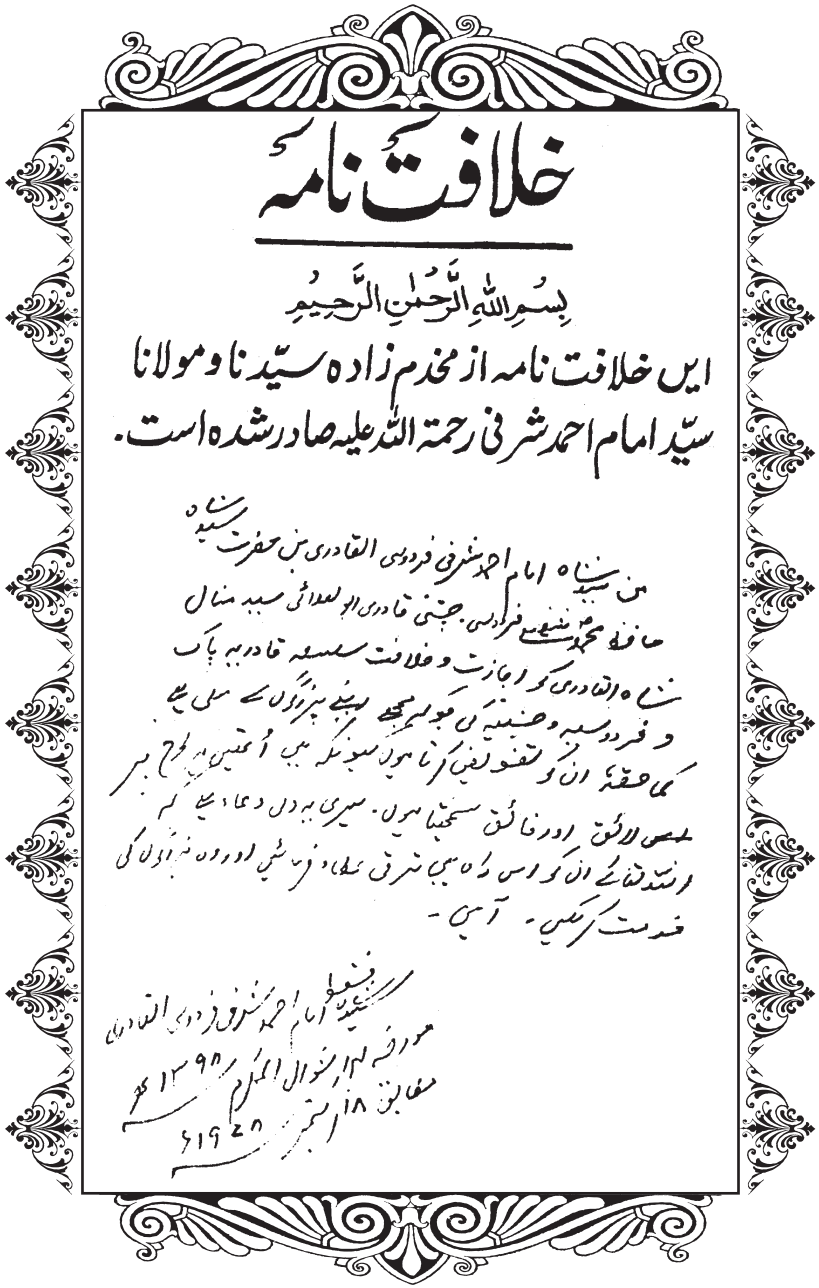

خلافت نامہ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

این خلافت نامہ از مخدوم زادہ سیدنا و مولانا
سید امام احمد شرفی رحمۃ اللہ علیہ صادر شدہ است۔

من سید شاہ امام احمد شرفی فردوسی القادری بن حضرت سید شاہ
حافظ محمد مصطفی فردوسی چشتی قادری ابو العلائی سید منال
شاہ القادری کو اجازت و خلافت سلسلہ قادریہ پاک
و فردوسیہ و حسینیہ جو مجھے اپنے بزرگوں سے ملی ہے
کما حقہ ان کو تفویض کرتا ہوں کیونکہ میں ان کو ہر طرح سے
اہل و لائق اور فائق سمجھتا ہوں۔ میری بہ دل دعا ہے کہ
اللہ تعالیٰ ان کو اس راہ میں ترقی دے اور دین بزرگوں کی
خدمت کریں۔ آمین۔

فقط
سید امام احمد شرفی فردوسی القادری
مورخہ ۱۴ شوال المکرم ۱۳۹۸ھ
مطابق ۱۸ ستمبر ۱۹۷۸ء

খেলাফত নামা

'মখদুম জাদা হজরত সৈয়েদনা মৌলানা সৈয়দ ইমাম আহমদ শরাফী (রহঃ) দেওয়া খেলাফত নামা'

আমি সৈয়দ শাহ ইমাম আহমদ শরাফী ফিরদৌসি আল কাদেরী, বিন হজঃ সৈয়দ শাহ হাফিজ মহঃ মোস্তফা ফিরদৌসি, চিস্তি, কাদেরী, আবুল ওলায়ি, হজঃ সৈয়দ মানাল শাহ আল কাদেরী কে সিলসিলায়ে কাদেরীয়া পাক ও ফরিদৌসিয়া, ও হোসেনিয়ার খেলাফত ও এজাজত যাহা আমি নিজের বুজুরগনের নিকট হইতে পাইয়াছি তাহা আমি ইনাকে প্রদান করলাম, কারণ আমি উনাকে সমস্ত দিক দিয়েই যোগ্য ও উপযুক্ত মনে করলাম, আরও আমি উনাকে দোওয়া করিতেছি যেন আল্লাহ পাক উনাকে এর চরম শিখরে পৌঁছে দেন এবং উনি যেন বুজুর্গানে দীনের সেবায় নিয়েজিত থাকেন।

আমিন

সৈয়দ শাহ ইমাম আহমদ শারাফি ফিরদৌসি আলকাদেরী

১৪ই-শওয়াল-১৩৯৮ হিজরী-ইং-৮ই মেপ্টেমবর ১৯৭৮